ঝরাপাতার ঝাঁপি

সাগরময় ঘোষ

Ghosh, Sagarmaya



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৫৯

মূল্য : চার টাকা

শুভময় ঘোষ

যে ছিল আমার সর্বাধিক
অনুরাগী ও উৎসাহী পাঠক

কৈফিয়ত

'সম্পাদকের বৈঠকে' লেখার পর সমগোত্রীয় লেখা থেকে লেখকের কলম বিরতি নিয়েছিল। কিন্তু গুদাম থেকে সওদা এনে বাজারে ঢেলে দেবার পরেও বস্তা ঝাড়া দিলে উদ্বৃত্ত কিছু থাকেই। এ-বইয়ের লেখাগুলি সেই রকমই কিছু, যা ১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার, জলসা, ঘরোয়া, সাজঘর ইত্যাদি পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। লেখক যে লেখাকে ঝরাপাতার দলে খারিজ করে দিয়েছিল তা-ই সংগ্রহ করে এনে প্রকাশক তৈরি করলেন এই ঝাঁপি। তাঁর দুঃসাহসকে বলিহারি!

১

দীর্ঘকালের বিরতির পর পাঠকদের কাছে আবার উপস্থিত হচ্ছি। এবারে আর 'সম্পাদকের বৈঠকে' নয়, নতুন নামে। সাজ-বদল হলেও রূপ-বদল ঘটেনি। আমার এই লেখার শিরোনামার পরিবর্তন দেখে পাঠকরা যদি মনে করে থাকেন এর বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন ঘটবে, তাহলে ভুল করবেন। 'সম্পাদকের বৈঠকে' ছিল সাহিত্যবিষয়ক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নানা কাহিনী, কখনো সাহিত্যিকদের জীবনের ঘরোয়া কথা। নূতন নামে যে লেখার সূত্রপাত হল, তাতে সাহিত্য ও সাহিত্যকদের কথা তো থাকবেই, তবে এ-লেখার পরিধি কিঞ্চিৎ ব্যাপক। একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা কাজে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার কিছু কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে 'সম্পাদকের বৈঠকে' নামের গ্রন্থে, বহু কাহিনী এখনও অলিখিত। সে-কাহিনীর উপর কালির কালিমা লেপন করার বাসনা আমার নেই, হয়তো সে-কাহিনী চিরকালই অলিখিত থেকে যাবে। তবু এমন অনেক ঘটনা আছে যা আড্ডায় বন্ধুদের কাছে শুনেছি, এমন অনেক চরিত্র দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যে-চরিত্র থেকে সাহিত্যিকরা রসের উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন, এমন অনেক মানুষকে আমি জেনেছি বাইরে থেকে দেখে যাদের আসল পরিচয় মেলে না, অন্তরঙ্গভাবে মিশলে দেখা যায় তাদের আরেক রূপ। আমি এদেরই কথা বলব।

আপনারা হয়তো বলবেন, লিখতে বসে এতখানি ভূমিকা কেন ফেঁদে বসলাম। আসলে উদ্দেশ্যটা ফাঁদ পেতেই বসা, পাঠক ধরবার জন্যে। 'সম্পাদকের বৈঠকে' পড়ে আপনারা আনন্দ পেয়েছিলেন,

ইনামও দিয়েছিলেন। এবার মুজরো নিয়েছি আসর জমাবার, অর্থাৎ আপনাদের খুশি করবার। কিন্তু আমার হাতের সম্বল তুরুপের সেই একটিই তাস, সম্পাদকের অভিজ্ঞতাই আমার সেই তুরুপের টেক্কা।

সেই পুরোনো কথাই যদি শোনাব তাহলে এই নূতন নামে এত বাগাড়ম্বর কেন? এ প্রশ্ন নিশ্চয় ইতিমধ্যে আপনাদের মনে ঘাই মারছে। টোপ ফেলেছি, আপনারাও ঠোক্কর দিচ্ছেন, এখন গেঁথে তুলতে পারাটা আমার হাতযশ। নতুন নামকরণ হয়েছে বলে আমি অভিনব কিছু একটা আপনাদের সামনে উপস্থিত করব এমন অহঙ্কার আমার নেই। রসের কারবারে আমি মহাজনদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছি মাত্র। অর্থাৎ পুরোনো মদ নতুন বোতলে ঢেলে আপনাদের পরিবেশন করার প্রয়াসী, লেবেলটা শুধু বদলে দেওয়া হল।

মদের কথা উঠতেই মনে পড়ে গেল শাল্‌কের ভোম্বলদার কথা। ঢের মাতাল দেখেছি কিন্তু ভোম্বলদার মত সেয়ানা মাতাল আমি আজও দেখিনি।

ভোম্বলদা একদিন বললেন—'আজ ভাই আমাকে একটু খেতেই হবে।'

সবাই অবাক। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ভোম্বলদা নেশা করেন, সেটা সবারই জানা। হঠাৎ আজ বিশেষ করে খাবার কী কারণ ঘটল।

প্রশ্ন করতেই ভোম্বলদা বললেন—'দেখছিস না, আজ কেমন খট্‌খটে রোদ্‌দুর উঠেছে।'

আরেকদিন ভোম্বলদা বললেন—'আজ কিন্তু আমার একটু না খেলে চলবেই না।'

এবারের অজুহাতটা কী শোনা যাক্। প্রশ্ন করা মাত্র ভোম্বলদা

চোখ বড় বড় করে বললেন—'তোরা আবার কারণ জিজ্ঞাসা করছিস? দেখতে পাচ্ছিস না দিনটা কেমন মেঘলা হয়ে আছে।'

সুতরাং রোদ উঠলেও যাকে মদ খেতে হবে এবং না উঠলেও এ-হেন ভোম্বলদা একদিন সন্ধ্যায় ওয়েস্টেন স্ট্রীটের ভাঁটিখানা থেকে চুর-চুর মাতাল হয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে এসে দাঁড়িয়েছেন হাওড়াগামী ৩৫ নম্বরের বাস ধরবার জন্য। পকেটে বাড়তি পয়সা নেই যে ট্যাক্সি ধরবেন আর থাকলেও ট্যাক্সি পাচ্ছেন কোথায়। ওসময়ে ভগবানকে খোঁজ করলে হয়তো মিলবে, ট্যাক্সি?

অগত্যা সরকারী বাসই একমাত্র সম্বল। বাদুড়ঝোলা অবস্থায় মানুষভর্তি এক-একটা বাস আসে, ভোম্বলদার ওঠা হয় না। দু-একটা বাস-এ চেষ্টা করলে যে পাদানিতে দাঁড়ানো যায় না এমন নয়, কিন্তু কোন দরজা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করবেন সেই পাঁয়তারা কষতে কষতেই বাস ছেড়ে দেয়। ভোম্বলদার মেজাজ তিরিক্ষি। স্টপেজে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ভোম্বলদার কসরৎ চলছে, ওদিকে নেশার বারোটা বাজার উপক্রম।

আবার একটা বাস ঝড়ের বেগে ছুটে এসেই স্টপেজে দাঁড়াল। ভোম্বলদা এবার মরিয়া হয়ে উঠলেন। যে-করে হোক বাস-এ চড়তেই হবে। কনুইয়ের গোঁত্তা মেরে লোকের পা মাড়িয়ে এবং প্রচুর গলাবাজি করার পর ভোম্বলদা বাসে উঠলেন। বাসসুদ্ধ লোক একটা বে-হেড্ মাতালকে ঐ অবস্থায় বাসে উঠতে দেখে ঘৃণায় ভুরু কুঁচকে উঠলো, কিন্তু ভোম্বলদার ভ্রূক্ষেপ নেই। গুঁতোগুঁতি করে এক ভদ্রলোকের পাশে বসে পড়লেন। যার পাশে বসলেন তিনি মাতালের ছোঁয়া বাঁচাবার জন্যে যথাসম্ভব কুঁকড়ে গেলেন, চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ।

বাসটা মোড় ঘুরে মিশন রোতে পড়তেই ভোম্বলদা পাশের সেই কাঠ হয়ে বসে থাকা ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে কী যেন একটা বিড় বিড় করে বললেন। কথা জড়িয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে।

কী বলতে চাইছেন তা বোঝা না গেলেও ভক্‌ করে দেশী মদের উগ্র গন্ধ বেরিয়ে আসতেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে নাক চাপা দিলেন।

ভোম্বলদার তখন একটা জরুরী প্রশ্ন মাথায় ঢুকেছে, তার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এবার গলার স্বর আরেকটু পরিষ্কার করে এবং জিভের জড়তা অনেকটা কাটিয়ে পাশের সেই ভদ্রলোককে আবার প্রশ্ন করলেন—'মশাই শুনছেন ?'

পাশে উপবিষ্ট মহাশয় রুমালটা আরো জোরে নাকে চেপে ধরলেন, সাধ্যমত আরো একটু কুঁকড়ে গেলেন। কিন্তু ভোম্বলদার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না।

ভোম্বলদা ছাড়বার পাত্র নন। জরুরী প্রশ্ন, তাই উত্তর জানার জন্য তখন রোখ চেপে গিয়েছে। গলার স্বর আরেক ধাপ চড়িয়ে এবং মুখটা যথাসম্ভব ভদ্রলোকের কানের কাছে এনে বললেন—'বলি ও মশাই, শুনছেন ?'

এবার আর ভদ্রলোক চুপ করে থাকতে পারলেন না। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ করে উঠলেন।

'শুনছি বৈকি। কী বলবার আছে বলুন না। যত্তো সব···'

ভোম্বলদার মুখের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন নেই। গলার স্বরকে যৎপরোনাস্তি মোলায়েম করে জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'ও, তাহলে শুনছেন।'

'বললাম তো শুনছি।' একটা চাপা গর্জন।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?' অমায়িক কণ্ঠস্বর।

'আঃ, কেন ভ্যাজর ভ্যাজর করছেন। যা বলবার বলুন না।' মেজাজ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল ভদ্রলোকের।

ঢুলু ঢুলু চোখে ভোম্বলদা আবার প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা, আমি কি উঠিচি ?'

এমন উদ্ভট প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক ভোম্বলদার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই চুপ মেরে গেলেন।

ভদ্রলোককে নিরুত্তর দেখে ভোম্বলদা আবার প্রশ্ন করলেন—'ও মশাই, আমি কি উ···ঠি···চি···?' 'চি' শব্দটার উপর জোর দিয়ে এবং যতটা সম্ভব টেনে লম্বা করে বলে ভোম্বলদা ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালেন। বাস্-এ উঠতে পেরেছেন, ভোম্বলদার কাছে সেটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ভদ্রলোক দেখলেন একটা কিছু উত্তর না দিলে লোকটা হুজ্জুত বাঁধাবে। পাগল আর মাতালকে বিশ্বাস নেই। কড়া মেজাজেই বললেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি উঠেছেন। এবার চুপ করে বসে থাকুন, বেশি কথা বাড়াবেন না।'

নির্বিকারচিত্ত ভোম্বলদা কারুর মেজাজের ধার ধারেন না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা নিজের বুকের উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন—'আমাকে কি আপনি চেনেন?'

'না, চিনি না এবং চিনবার দরকারও নেই।' রাগে গর গর করতে করতে বললেন ভদ্রলোক।

এবারে মদ্যপানরত জীবানন্দের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ীর বাচনভঙ্গিতে ভোম্বলদা বললেন—'তা হলে কী করে জানলেন যে আমিই উঠিচি?'

ভদ্রলোকের রুমাল তৎক্ষণাৎ নাকের উপর থেকে কোলে খসে পড়ল। বাসসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে ভোম্বলদার দিকে তাকিয়ে।

আরেক সন্ধ্যায় খালাসীটোলায় বসে ভোম্বলদা আসর জমিয়েছেন। হঠাৎ বললেন—'তোরা তো কথায় কথায় আজকাল রবি ঠাকুর কপচাস। বল দেখি দুটো লাইন যা তোদের রবি ঠাকুর ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি আজ পর্যন্ত লিখতে পারেনি।'

আসরের তরুণ ছোকরা বললে—'কেন? মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

ধমক দিয়ে ভোম্বলদা বললেন—'তোরা যত সব বস্তাপচা লাইনগুলি মনে রেখেচিস। ওরকম তো ঝুড়ি ঝুড়ি আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বললে—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির—'

'থাম থাম। ও সব লাইন তোদের রবি ঠাকুর হাজার হাজার লিখে গেছেন এবং বাঁ হাতে লিখে গেছেন।'

সবাই হতভম্ব। তা হলে এমন কী লাইন লিখে গিয়েছেন যা ডান হাতে লেখা আর যা ভোম্বলদা ছাড়া আর কেউ বলতে পারছে না?

সবাইকে নিরুত্তর দেখে ভোম্বলদা বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন—'বলতে পারলি নে তো? তবে শোন।'

ভোম্বলদা এবার ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। গুন্‌গুন্ ক'রে একবার সুর ভেঁজে নিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় টপ্পার দানা এনে কাফি সুরে গেয়ে উঠলেন—

'জানতে চাও আমার উইশ কী?
একটি ছটাক সোডার জলে বাকি তিন পো হুইস্কি।'

ভোম্বলদার কাণ্ড দেখে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

গান থামিয়ে একটা চ্যালেঞ্জের ভাব দেখিয়ে ভোম্বলদা বললেন—'কোনো শালা কবি পারবে এমন লাইন লিখতে? কালিদাস ভবভূতি? শেক্‌সপীয়র মিলটন তো কোন ছার। তোরা জেনে রাখ, পৃথিবীতে রবি ঠাকুর একটিই জন্মায়।'

বলেই ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে হাতজোড়া কপালে ঠেকালেন ভোম্বলদা।

সবাই বুঝলে নেশা চড়েছে ভোম্বলদার। কে তর্ক করতে যাবে এ সময়ে ওঁর সঙ্গে। ওটা যে একটা নাটকের সংলাপ তা বলতে গেলে আবার ধমক খেতে হবে। সুতরাং ঘাঁটিয়ে কাজ কি।

নীরবতা ভঙ্গ করে ভোম্বলদাই বলে উঠলেন—'তবে হ্যাঁ। আরেকজন উর্দু কবির একটা শায়ের মনে পড়ে গেল। সেটা প্রায় তোদের রবি ঠাকুরের কাছাকাছি যায়। আমীর খসরুর নাম শুনেছিস? শুনিসনি তো? তবে শোন তাঁর একটা বয়েৎ—

'রহেগা কৌন, ঔর রহেগী কিস্ কী?
রহেঙ্গে হাম, ঔর রহেগী হুইস্‌কি।'

ভোম্বলদা থামলেন। মুখে আত্মতৃপ্তির ভাব। সবাই বুঝে গেল এই দুই কবির ঐ কয়টি লাইন ভোম্বলদার জীবনের আদর্শ। এখন কোনো মন্তব্য করতে গেলেই জীবনদর্শন নিয়ে দীর্ঘ লেকচার শুনতে হবে।

এ-হেন ভোম্বলদা একদিন সকালে আপিসে ঢুকেই সহকর্মীদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, জীবনে আর কোনোদিন কোনোরকম নেশা করবেন না।

২

ভোম্বলদা সেদিন বেলা এগারোটায় আপিসে ঢুকেই সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন—'যাক, তোরা বেঁচে গেলি। তোদের ভোম্বলদার বারোটা বেজে গিয়েছে।'

ক্লাইব স্ট্রীটের এক মার্চেন্ট আপিসে রেকর্ড কীপিং ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র ক্লার্ক ভোম্বলদা। ওঁরই নিচে আরো তুজন আছে, রাখাল আর বাদল। বাহান্ন বছর বয়স হয়েছে ভোম্বলদার, আর তিন বছর বাদে রিটায়ার করবার কথা।

সংসারের ঝামেলা বলতে তেমন কিছুই নেই ভোম্বলদার। স্ত্রী আর এক বিধবা বোন। একটি মাত্র মেয়ে, চোদ্দ থেকে পনেরোয় পা দিতে-না-দিতেই বিয়ে দিয়ে দিলেন হাওড়া-আমতা রেলের এক গার্ডের সঙ্গে।

ছেলের বাপ মেয়ে নিয়ে যখন নিজের বাড়ি ফিরলেন, ছেলের মা মেয়ের গায়ের গয়না প্রথমে গুনে গুনে দেখেই চীৎকারে পাড়া মাথায় তুললেন, গয়না নিশ্চয় কম দিয়েছে।

খবর দিতেই পাড়ার স্যাকরা ছুটে এল। গা থেকে একে একে সব গয়না খুলে ওজন করা হল। আট ভরির জায়গায় সাড়ে চার ভরি।

পরদিনই ছেলের বাপ মেয়ের বাপকে জানিয়ে দিলেন, জোচ্চোরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তাঁরা রাখতে চান না, সুতরাং মেয়েকে তাঁরা কোনোদিন বাপের বাড়ি পাঠাবেন না।

ভোম্বলদারও আত্মসম্মানবোধ টনটনে। আজ অবধি কোনোদিন ছেলের বাপকে খোসামোদ করেননি মেয়েকে বাপের কাছে পাঠাবার জন্য।

ভোম্বলদার পাড়ার লোকে বলে, এই ঘটনার পর থেকে সেই যে মদ ধরলেন ভোম্বলদা, আজ তা তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় অনুপান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ-সব কাহিনী রাখাল বাদল, ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন সবাই জানে। আর এ-ও জানে, এই সর্বনাশী নেশার জন্যে ভোম্বলদা আজ সর্বস্বান্ত। দেনা প্রায় প্রত্যেকের কাছেই কিছু-না-কিছু আছে।

রাখাল বাদলের দল জানে, সে-দেনা কোনোকালেই শোধ হবে না। একদিক দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত। রোজ বিকেলে আপিসের ছুটি হলেই ভোম্বলদা আর বলতে পারেন না—দে দেখি পাঁচটা টাকা, কাল আপিসে এসেই ফেরত দেব।

ভোম্বলদা জানেন, বাদলের কাছে টাকা চাইলেই ও বলবে—'এ পর্যন্ত বারো টাকা পাওনা হয়েছে ভোম্বলদা, সেটা ফেরত পেলেই…'

অগত্যা আপিসের দারোয়ানের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হয় ভোম্বলদাকে। মাসের প্রথম দিন মাইনে পেলেই সুদ সমেত আসল শোধ না করলে আর রক্ষে নেই। আপিসের নিচে পানওয়ালা আছে আরেক পাওনাদার। তার কাছেও বেশ কিছু টাকা ধার নেওয়া আছে, শোধ করার নাম নেই। পান সিগারেট খেতে আপিসের লোক যে আসবে তার কাছেই পানওয়ালা ভোম্বলদার নামে অভিযোগ জানাবে। আপিসের হেন লোক নেই যার কাছ থেকে ভোম্বলদা টাকা ধার করেননি, হেন লোক নেই যে ভোম্বলদার এই স্বভাব জানে না।

আপিসে ঢুকেই সবাইকে চমকে দিয়ে ভোম্বলদা যখন ওঁর বারোটা বেজে যাবার সংবাদ ঘোষণা করলেন, রাখাল বাদল নরেনের দল প্রথমে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ভোম্বলদা বলে কি!

নিজের চেয়ারে বসে ভোম্বলদা হাঁপাতে লাগলেন। শরীর যে সুস্থ নয় সবাই তা বুঝতে পারল। ঘরের বেয়ারা বংশীকে ডেকে ভোম্বলদা বললেন—'ছুটির দরখাস্তর একটা ফর্ম এনে দে।'

ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন বললে—'ভোম্বলদা কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ?'

'আর বলিস কেন।' দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন ভোম্বলদা।—'ধড়ফড়ানি!'

'ধড়ফড়ানি ?'

'হ্যাঁ, বুক ধড়ফড়ানি! কাল রাত্রে হঠাৎ গা দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল, যাই-যাই অবস্থা। তোদের বৌদি ছুটে গিয়ে পাড়ার কালী ডাক্তারকে ডেকে আনলে; ইনজেক্‌শন পড়ল, ওষুধ খাওয়ালে আর বললে—কমপ্লিট রেস্ট।'

রাখাল বাদল নরেনের চোখে মুখে বিস্ময়।

'কাল রাত্রে যখন ঐ অবস্থা গেছে, আজ সকালেই আপিসে চলে এলেন ? বৌদি আসতে দিলেন আপনাকে ?'

'সে কি দেয়, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ট্যাক্সি করে যাবো আর আসবো এইসব বলে রাজী করিয়েছি।'

বাদল বললে—'আপনার আসবার দরকারটাই বা কি ছিল। মুরারী তো আপনার পাড়াতেই থাকে, তাকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিলেই তো হত।'

অ্যাকাউন্টস্‌ ডিপার্টমেন্টের মুরারী শাল্‌কেরই ছেলে, ভোম্বলদার পাড়াতেই থাকে। পাড়ায় নামকরা মাতাল বলে ভোম্বলদার খুব বদনাম, মুরারী সেই ভয়ে পারতপক্ষে ভোম্বলদার সঙ্গে মেলামেশা করে না।

ভোম্বলদা বিরক্তির সঙ্গে বললেন—'না, খবর পাঠিয়ে দিলেই হত না।'

রাখাল আর বাদল জানে যে, আপিসের কোনো কাজই প্রায় ভোম্বলদাকে করতে হয় না, ওরা দুজনে সে-কাজ করে দেয়। সুতরাং কাজ বুঝিয়ে দেবার প্রশ্ন নেই। ছুটির দরখাস্ত ? ওটা একটা অজুহাত। বাড়ি বসে চিঠিতে দরখাস্ত পাঠালেই চলত।

ওরা অনুমানে বুঝে নিলে, সশরীরে আপিসে চলে আসার আসল কারণটা কী। টাকার দরকার। কথাটা খুলে বলতে বোধ হয় ভোম্বলদা সঙ্কোচ বোধ করছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় কি।

অবশেষে ভোম্বলদাই কথাটা পাড়লেন। বললেন—'আজকাল ডাক্তারগুলোও হয়েছে তেমনি। পাড়ার ডাক্তার, বহুকালের জানাশোনা, তাই ভিজিট দিই না। তাই বলে দামি ওষুধের ফিরিস্তি দিয়ে দমকা খরচ করিয়ে দেওয়া !'

রাখাল অনুকম্পার সুরে বললে—'ডাক্তারের উপর আপনি অযথা রাগ করছেন ভোম্বলদা। হার্টের ব্যামো, কখন কী হয় বলা যায় না। ওষুধপত্র নিয়মিত খেতে হবে বৈকি।'

খেঁকিয়ে উঠলেন ভোম্বলদা—'মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না রাখাল। তোদের মুখে হিতোপদেশ শুনলে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত দম-দেওয়া গাঁজার কল্কের মত দাউ-দাউ জ্বলতে থাকে, ফাটবো-ফাটবো ভাব।'

প্রচণ্ড ধমক খেয়ে রাখাল বাদল নরেন একেবারে চুপসে গেল। একে বুক ধড়ফড়ানি, তার উপর মেজাজ আসমানে চড়েছে। আর ঘাঁটানো উচিত হবে না। যে-যার কাগজপত্র টেনে নিয়ে কাজে মন দিলে।

ছুটির দরখাস্তর ফর্ম নিয়ে বেয়ারা বংশী এসে হাজির। নিঃশব্দে ফর্মটা হাতে নিয়ে সাত দিনের ছুটির দরখাস্ত লিখে দিলেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেটটাও সঙ্গে গুঁজে দিয়ে বংশীকে বললেন—'যা, বড়বাবুকে দিয়ে আয়।'

বংশী চলে গেল। রাখাল বাদল নরেনের মুখে কোনো কথা নেই, ঘাড় গুঁজে তিনজনে কাজ করে চলেছে। ভোম্বলদা কিছুক্ষণ চুপচাপ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে সমানে পা নাচাতে লাগলেন। ছুটির দরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে, আপিসের কাজ যা

বুঝিয়ে দেবার তা তো বাদল আর রাখালের আগেই জানা। তবু নিরর্থক ভোম্বলদা চুপচাপ কেন বসে, বাড়ি চলে গেলেই তো পারেন।

ভোম্বলদার হাবভাবে বাড়ি যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে কলম পেন্সিল আলপিন পেপার-ওয়েট সব ভরে ফেললেন। এ-কাজ রোজ বংশীই করে, আজ ভোম্বলদা নিজের হাতেই তা সেরে রাখলেন। ভাবখানা যেন, ঝাঁপ বন্ধ হল, এবার উঠলেই হয়। না, ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। বাদল আড়চোখে সবই লক্ষ্য করছিল। এতক্ষণ ধরে যে-কথাটা বলবার জন্য ভোম্বলদা হাঁকুপাঁকু করছিলেন, মনে জোর এনে সব সঙ্কোচ কাটিয়ে কথাটা বলেই ফেললেন।

'হ্যাঁরে বাদল, কুড়িটা টাকা জোগাড় করে দিতে পারিস?' কথাটা বলার মধ্যে একটা করুণ সুর ফুটে উঠল। ভোম্বলদা কাতর চোখে বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে, একটা আশাপ্রদ উত্তরের উদ্বেগ তাঁর দুই চোখে।

বাদল অবিশ্বাস করতে পারল না। বুঝতে পারল সত্যি সত্যিই দামি ওষুধ লিখে দিয়েছে ডাক্তার, কিন্তু কিনবার মত টাকা নেই হাতে।

বাদল এবার অভিমানের সুরে বললে—'এই কথাটা আগে বললেই তো হত ভোম্বলদা, মিছিমিছি আমাদের উপর মেজাজ করলেন। আমরাও তো এই কথাই বলতে চাইছিলাম। দামি ওষুধপত্র যখন, প্রয়োজন হলে আমরা নিশ্চয় জোগাড় করে দেব।'

মুখে একটা পরম তৃপ্তির হাসি এনে ভোম্বলদা বললেন—'জানি জানি, তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল। আর ঐ হতভাগা কেষ্ট, ওই তো যত নষ্টের গোড়া। রোজ বিকেলে আপিস থেকে বেরোবার মুখে আমার পিছু নেবে আর কানের কাছে মন্তরের মত জপ করতে থাকবে—একটু ঘুরে গেলে হত না ভোম্বলদা। এই করেই তো আজ আমার এই হাল। বিপদে-আপদে তোদের কাছে যে দু-চার টাকা ধার চাইব তারও মুখ রাখেনি ঐ বেটাচ্ছেলে কেষ্ট।'

এ কথা এর আগেও বহুবার শুনেছে ভোম্বলদার মুখে। যত দোষ ঐ টাইপিষ্ট কেষ্টার! যেন কেষ্টা বেটাই চোর। বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতে কেষ্টর দেখা পাবার জন্যে ভোম্বলদার সে কী আকুলি-বিকুলি। তা কি আর রাখাল বাদল নরেন জানে না? এই সেদিন ওয়েস্টেন স্ট্রীটের ভাঁটিখানা থেকে বেরিয়ে হেয়ার স্ট্রীট থানার সামনের মাঝ রাস্তায় কেষ্টর গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভোম্বলদা। দুজনেই চুরচুর মাতাল। দু পাশ থেকে গাড়ি অনবরত হর্ন মারছে। রাস্তার মাঝখানে দুজনে গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চাপা না দিলে কোনো গাড়ির যাবার উপায় নেই। গালিগালাজ, চীৎকার, লোকজন, হৈ চৈ। নির্বিকারচিত্তে তখনো দুজনে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

গোলমাল শুনে থানা অফিসার ছুটে এসে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন—'মাতলামি করার আর জায়গা পেলেন না? রাস্তা ব্লক করেছেন কেন?'

জড়িত কণ্ঠে ভোম্বলদা বললেন—'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড্ উই ফল্!'

আর বলতে হল না। দুজনকেই গলাধাক্কা দিয়ে হেয়ার স্ট্রীট থানায় নিয়ে ভরলেন থানা অফিসার।

সে-দিনের পর থেকে কেষ্ট সব সময় চেষ্টা করে ভোম্বলদাকে এড়িয়ে চলতে, কিন্তু বিকেল হলেই কেষ্টকে না দেখলে অন্ধকার।

কেষ্টার উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে ভোম্বলদা চুপ করলেন। রাখাল বাদল নরেনের মধ্যে চোখাচোখি হতেই তারা হেসে ফেললে।

ভোম্বলদার দৃষ্টি এড়ায়নি। বললেন—'তোরা হাসাহাসি করছিস বটে কিন্তু তোদের বৌদির কি ধারণা জানিস তো? ওর ধারণা কেষ্টই যত নষ্টের মূল।'

বাদল বললে—'এ কিন্তু আপনার অন্যায় ভোম্বলদা। আপনি

নিশ্চয় বৌদিকে তাই বুঝিয়েছেন। তা না হলে উনি ওরকম ধারণা পোষণ করবেনই বা কেন।'

ভোম্বলদা চোখ বিস্ফারিত করে বললেন—'আমি বলতে যাব কেন, ও নিজেই বাহাদুরি করতে গিয়ে অমন ধারণা করিয়ে দিয়েছে।'

ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন ভোম্বলদার কথার প্রতিবাদ না করে পারল না।

'আপনি মিছিমিছি কেষ্টর উপর দোষ চাপাচ্ছেন। ও বেচারি নেহাৎ ভালো মানুষ। আসলে বৌদির কাছে গালমন্দ খাবার ভয়ে দোষটা এর ওর তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াই আপনার স্বভাব।'

ভোম্বলদা নরেনের কথা শুনে রাগ করা দূরে থাক হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন—'তাহলে শোন। তোদের ভালোমানুষ কেষ্টর ফিচলেমি বুদ্ধিটা শোন। এই গেল পয়লা বৈশাখের দিন বিকেলে আপিস থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব মনস্থির করে হাওড়ার ট্রাম স্টপেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ জমাট বেঁধে আছে। কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। হঠাৎ কোথা থেকে কেষ্টা হন্তদন্ত হয়ে এসেই কানের কাছে মন্ত্র জপ করা শুরু করে দিলে

—'ভোম্বলদা, দেখেছেন কী রকম মেঘ করেছে।'

—'হুঁ, দেখেছি।'

—'এখুনি কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় উঠবে।'

—'তা উঠুক। হাওড়া যাবার ট্রামও এসে পড়ল বলে।'

—'বৃষ্টিও হবে জোর। দেখছেন না এক ফোঁটা হাওয়া নেই, তার উপর ভ্যাপসা গরম।'

ভোম্বলদা কথা থামিয়ে রাখাল বাদল আর নরেনের মুখের দিকে তাকালেন।

'বুঝেছিস, কেষ্টাকে তখন নেচার স্টাডিতে পেয়ে বসেছে। কানের কাছে অনবরত ভ্যাজর ভ্যাজর করে বোঝাতে লাগল,

—প্রচণ্ড ঝড় আসছে, সাক্ষাৎ কালবৈশাখীর ঝড়। সাংঘাতিক বৃষ্টি হবে, জলে ভেসে যাবে কলকাতা শহর। রাস্তায় এক কোমর জল। ট্রাম-বাস বন্ধ। রিক্সা ভাড়া চাইবে চার টাকা, ইত্যাদি বলে আমায় কিনা উপদেশ দিচ্ছে পথে কোথাও যেন বসে না পড়ি, ট্রাম এলেই যেন সোজা হাওড়া ইষ্টিশানে নেমে বাস ধরে শালকে চলে যাই।'

এক নাগাড়ে কথাগুলি বলে ভোম্বলদা একটু দম নিয়ে বললেন—'বুঝলি কিছু?'

বাদল বললে—'কেষ্টা তো ভালো কথাই বলেছিল।'

চোখ পাকিয়ে ভোম্বলদা বললেন—'এটাকে তুই বলছিস ভালো কথা! ওর শয়তানি বুদ্ধিটা দেখলি না! পাগলকে পোল না নাড়াবার গল্পটা জানিস তো। কেষ্টার মতলবটা ছিল তা-ই!'

এর মধ্যে মতলব কি থাকতে পারে ভেবে পেল না রাখাল বাদল নরেন। ওরা ভোম্বলদার মুখের দিকে হতবাক দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কৌতূহল চাপতে না পেরে রাখাল বললে—'তারপর কি হল, সত্যি সত্যিই বাড়ি চলে গেলেন?'

ধমকে উঠলেন ভোম্বলদা—'মাছিমারা কেরানির কাজ করে করে তোরা কি বুদ্ধি-সুদ্ধি সব খুইয়ে বসে আছিস? হবে আবার কি। যা হবার তাই হল।'

বিস্মিত বাদল বললে—'সত্যিই কোথাও গিয়ে জমে গেলেন?'

'জমা মানে কি। হাওড়া ব্রীজের এ-পাশে বাঁদিকে গঙ্গার ধারের ভাটিখানায় গিয়ে সবে বসেছি, এল তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি। ব্যস, শুরু হয়ে গেল আউন্সের পর আউন্স। বৃষ্টি যখন থামল তখন রাত্তির নটা। ততক্ষণে আমাদের চল্লিশ আউন্স পার হয়ে গেছে।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন বললে—'কেষ্ট আপনার সঙ্গে ছিল? সে আপনাকে বারণ করল না?'

ভোম্বলদা বললেন—'এতক্ষণ তোদের তাহলে বলছি কি। অনেক ফিচেল দেখেছি, কেষ্টার জুড়ি মেলা ভার। কেষ্টাকে আমি পই পই করে বললাম—দেখ কেষ্টা, তোর বৌদির কাছে কিরে কেটেছি যে আজ বচ্ছরের প্রথম দিনটা ও-সব করব না।'

শুনে কেষ্টা শুধু বললে—'ভোম্বলদা, একবার কাশুন তো।'

শোনো কথা। সর্দি কাশি কিছুই আমার হয়নি, খামকা কাশতে যাব কেন?

কেষ্টা তবু ছাড়ে না। বার বার বলতে লাগল, কেশেই ফেলুন না একবার।

কেষ্টার কথায় ওর অনুরোধে আর উপরোধে শুক্‌নো গলায় খক্ খক্ করে কেশে ফেললুম।

কেষ্টা নিশ্চিন্ত হয়ে বললে—'যাক, দোষ কেটে গেল।'

'দোষ কেটে গেল মানে?' অবাক হয়ে কেষ্টাকে প্রশ্নটা করতেই ও বললে—

'কিরা কাটলে সে কিরা কাটান দেবার বিধান আছে আমাদের শাস্ত্রে। আমাদের মৈমনসিং-এ একটা ছড়া আছে—

নদীর জলে কাইশ্যা
কিরা গেল ভাইস্যা।

সাক্ষাৎ মা গঙ্গার সামনে বসে আপনি কেশেছেন, সব পাপ স্খালন হয়ে গেল।'

ভোম্বলদার মুখে এ ঘটনা শুনে বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন একেবারে ভোম মেরে গেল। ওদের মুখে আর কোনো রা নেই।

সুযোগ পেয়ে ভোম্বলদা বললেন—'কি, তোদের ভালো মানুষ কেষ্টর পক্ষে আর কোনো ওকালতি করবার আছে কি?'

লজ্জিত হয়ে নরেন বললে—'এ-কথা শোনার পর আমার কথা আমি প্রত্যাহার করলাম ভোম্বলদা।'

ভোম্বলদা হন্ হন্ করে করিডর ধরে চলে গেলেন, রাখাল বাদল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

খবরটা মুরারীই এনে দিল, সেই শাল্‌কের মুরারী। ভোম্বলদার সম্পর্কে এ রকম একটা মারাত্মক খবর শুনতে হবে, রাখাল বাদল আর নরেন তা কোনোদিন কল্পনাই করতে পারেনি।

ভোম্বলদা সেই যে গেলেন তারপর দিন-চার আর কোনো খবর নেই। ওরা জানে ভোম্বলদা খাচ্ছেন-দাচ্ছেন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন —সুতরাং ভালোই আছেন। ভালমন্দ কিছু একটা হলে অন্তত আপিসে একটা খবর আসতই।

সেই খবরই নিয়ে এল মুরারী।

একই পাড়ার ছেলে মুরারী, একই আপিসে চাকরি করে। ভোম্বলদার অসুখের খবর মুরারী শুনেছিল। সেদিন রবিবার। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে ডিস্পেন্সারীর কাছে এসে দেখে ডাক্তারবাবু বসে আছেন। খেয়াল হল, ভোম্বলদার খবরটা একবার নিলে হয়।

ডাক্তারবাবু বললেন—'আপনাদের ভোম্বলদার মতো এরকম নেশাখোর লোক আমি দেখিনি মশাই। এসব লোকের চিকিৎসা করাও এক ঝকমারি। গতকাল হঠাৎ ওঁর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে হাজির। কী ব্যাপার! হার্টের ট্রাবল্ আবার বাড়ল না কি! জিজ্ঞাসা করতেই ওঁর স্ত্রী বললেন—হার্টের ব্যামো এখন আর সে রকম কিছু নেই, তবে মাথার ব্যামো দেখা দিয়েছে।'

'মাথার ব্যামো মানে?'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, এমনিতে তো ভালই ছিলেন, হঠাৎ ক'দিন ধরে ওঁর মাথার একটু গোলমাল শুরু হয়েছে। সারাদিন দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরেই শুয়ে থাকেন, কোনো ঝামেলা নেই। শুধু থেকে-থেকে গরম জল চেয়ে পাঠান। বলেন, এক কাপ গরম জল দাও দাড়ি কামাবো।'

আমি যত বলি—'সে কী, সকালে দু-দুবার দাড়ি কামালে, আবার দাড়ি কামাবে কি। ও বলে—কই না তো, কোথায় দাড়ি কামালাম, এখন কামাবো, শিগগিরি গরম জল দাও। আমার সন্দেহ হচ্ছে ওঁর নিশ্চয় মাথাটা খারাপ হয়েছে। ডাক্তারবাবু, আপনি একবার দেখবেন চলুন।'

যেতে হল ডাক্তারবাবুকে। ভোম্বলদা দিব্য আদর আপ্যায়ন করলেন, কথাবার্তায় বেচাল কিছুই দেখলেন না। বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন, রক্তের চাপও দেখলেন, অপেক্ষাকৃত অনেক ভালো। মাথার গোলমালটা কোথায়!

ভোম্বলদার স্ত্রী ডাক্তারবাবুর জন্যে চা করে আনতে রান্নাঘরে ঢুকতেই গলাটা খাটো করে ভোম্বলদা ডাক্তারবাবুকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন– 'আপনি যা অনুমান করছেন ডাক্তারবাবু, সে-সব কিছুই নয়। মাথা আমার ঠিকই আছে। আপনি গরমজল দিয়ে দু-এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছিলেন কি না, তাই দাড়ি কামানোর নাম করে গরমজলটা একটু ঘন ঘন চেয়েছিলাম বলেই এই বিভ্রাট।'

সব বৃত্তান্ত মুরারীকে বলেই ডাক্তার বললে—'আপনাদের ভোম্বলদার চিকিৎসা করা আমার কম্মো নয়।'

মুরারীর কাছে এ-ঘটনা শুনে রাখাল বাদল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেনের চোখ ট্যারা।

৩

মাসের প্রথম দিন ভোম্বলদা আপিসে এলেন একটু বেলা করেই। রাখাল বাদল আর ডেসপাঁচ ক্লার্ক নরেন জানত যে, ভোম্বলদা আজ আপিসে একবার আসবেন। ছুটিও ফুরিয়েছে, তদুপরি আজ আবার মাইনে নেবার দিন।

ভোম্বলদা ঘরে ঢুকেই একবার বাদল রাখাল আর নরেনের দিকে চোখটা বুলিয়ে নিলেন। ওরা তিনজন তখনো একমনে কলম পিষে চলেছে, ভোম্বলদা ঘরে ঢুকেছে দেখেও যেন না-দেখার ভান। মুরারীর কাছে ভোম্বলদার কীর্তিকাহিনী শোনার পর থেকে ওরা তিনজন স্থির করেছিল যে, ভোম্বলদার নেশা সংক্রান্ত আর কোনো প্রশ্নই ওরা করবে না। কিন্তু ওই একটি প্রসঙ্গ ছাড়া ভোম্বলদার আর অস্তিত্বই বা কী। ও-প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া মানে ভোম্বলদার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা।

ভোম্বলদার কাছে সেইটিই ছিল চরম অবজ্ঞার নিদর্শন। ভোম্বলদা প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন—'দেখ্ বাদল, জীবনে অনেক আড্ডায় মিশেছি, অনেক লোকের সঙ্গে বসে নেশা করেছি, কিন্তু সত্যিকারের খানদানি রসিক আজও খুঁজে পেলাম না।'

কথাটা বলার মধ্যে ভোম্বলদা এমন একটা ভাব দেখালেন যেন হঠাৎ ভগবানের ডাক শুনতে পাওয়া লোক সংসার-বিরাগী হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মনের মতো গুরু পাবার আশায়, কিন্তু পাচ্ছেন না। ভোম্বলদার বক্তব্য হচ্ছে ওঁর নিজের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক নেশা করার মূল কারণ—ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।

ভোম্বলদা একদিন পরশপাথর খুঁজে পেয়েও ছিলেন এবং নিজেরই হঠকারিতার দোষে হারিয়েছিলেন।

পেয়েছিলেন সেই খালাসীটোলাতেই। এক সন্ধ্যায় ভোম্বলদা সেখানে গিয়ে দেখেন একতলায় টিনের ছাউনি দেওয়া চত্বরটায় লোকে লোকারণ্য, বসবার জায়গা পর্যন্ত নেই। তার উপর চেঁচামেচি হট্টগোল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ছোট্ট ঘরটাতে উঠে গিয়ে দেখলেন, লম্বা টেবিলটার একপাশে এক বৃদ্ধ ধ্যানস্থ হয়ে একা বসে আছেন। পাকা লাঠির মতো লম্বা কালো কুচকুচে শরীর, মাথায় প্রশস্ত টাক, সাদা গোঁপজোড়া চোয়ালের দু-পাশে ছুঁচের ডগার মতো সরু হয়ে বেরিয়ে আছে।

টেবিলের উপর একটি সোডার বোতল খোলা, এক ফোঁটাও সোডা ঢালা হয়নি। পাশে বিশ আউন্সের বোতল, তার তলানিতে আউন্স দুই তখনো বাকি।

দোকানের ছোকরা মোহন উপরে এসেছে কার কি লাগবে খবর নিতে। ভোম্বলদার কাছ থেকে অর্ডারমাফিক টাকাকড়ি নিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে মোহন বললে—'কি শ্যামবাবু, সোডাটা তো পুরোই রয়েছে। আর কয় আউন্স আনবো।'

এতক্ষণে ধ্যানভঙ্গ হল বৃদ্ধের। টেবিলের উপর একটা কাগজের টুকরোয় কিছু নুন আর আদা আছে। এককুচি মুখে ফেলেই শ্যামবাবু বললেন—'দে আর দশ আউন্স, পয়সা দিয়ে সোডা কিনেছি, ফেলে তো দিতে পারিনে।'

বোতলের তলানিটা গেলাসে ঢেলে বোতলটা ছোকরার হাতে তুলে দিলেন, সেই সঙ্গে দশ আউন্সের দামও। এক চুমুকে গেলাসের নির্জলা নির্ভেজাল তরল বস্তুটি নিঃশেষ করেই পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালেন। কোনো চিত্ত-চাঞ্চল্য নেই, নির্বিকার ধীর স্থির! সোডার বোতলে হাতও লাগালেন না, যেমন ছিল তেমনি আছে।



ভোম্বলদা বুঝে গেলেন এতদিনে বোধ হয় একজন গুরুর সন্ধান পেলেন। বৃদ্ধের কাছ ঘেঁসে বসেই ভোম্বলদা সবিনয়ে বললেন—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?'

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে শ্যামবাবু বললেন—'বলুন।'

'আপনার বয়স কতো জানতে পারি ?'

'তা সত্তর পার হয়েছে।'

শুনে ভোম্বলদার মত চালু লোকও ভোম্ মেরে গেলেন। মুখে আর কোনো কথা নেই।

ভোম্বলদাকে চুপ মেরে যেতে দেখে শ্যামবাবু বললেন—'কি ভায়া, বয়সটা শুনে চুপ মেরে গেলেন যে। আমাকে আর কি দেখছেন, দেখতেন যদি আমার বাবাকে! সতেরো বছর বয়সে নেশা ধরেছিলেন, বেঁচে ছিলেন নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত। কোনো দিনও কামাই যেত না। কিন্তু কোনো দিনও ওঁর পা টলতে দেখিনি।'

ভোম্বলদা অবাক হয়ে বললেন—'তা হলে তো দেখছি আপনি বাপ-কা-বেটা সিপাহি-কা-ঘোড়া। তা আপনি কবে থেকে এ-সব শুরু করেছেন ?'

শ্যামবাবু ধ্যানস্থ হয়ে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন - 'তা যা বলেছেন। আমাদের স্কুলের ফুটবল টিম গিয়েছিল শিবপুরে একটা টুর্নামেন্ট খেলতে। আমি বরাবরই রাইট-ইন-এ খেলতাম। পাঁচ গোলে জিতেছিলাম। তার মধ্যে তিনটি গোল আমি নিজেই দিয়েছি। খেলাশেষে ফুর্তিফার্তি করে যখন বাড়ি ফিরেছি তখন দশটা বেজে গিয়েছে। একটা সরু গলি পার হয়ে আমাদের বাড়ি, আমার তখন এমন অবস্থা যে গলির এ দেয়ালে একবার ঠোক্কর খাচ্ছি, ও দেয়ালে আরেকবার। বাড়ির সদর দরজাটা ভেজানোই ছিল, ধাক্কা দিয়ে খুলতেই দেখি বাবা দাঁড়িয়ে। ধরা পড়ে গেলুম।'

শ্যামবাবু থামলেন, সিগারেটে সুখ-টান দিয়ে সেটা ফেলে দিলেন। দশ আউন্সের বোতল থেকে অর্ধেকটা গেলাসে ঢেলে এক চুমুকে তা শেষ করলেন, সোডার বোতলে হাত লাগালেন না।

ভোম্বলদা জেনে গেলেন এতদিনে একটি খাঁটি মাতালের সন্ধান তিনি পেলেন। কিন্তু বাবার কাছে ধরা পড়ার পর কী হল তা জানার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বললেন—'ধরা পড়ে খুব প্রহার খেয়েছিলেন তো?'

শ্যামবাবু বললেন—'প্রহার হয়েছিল, তবে নেশা করার জন্যে নয়।'

অবাক হয়ে ভোম্বলদা বললেন—'তার মানে? আপনিও যে লুকিয়ে চুরিয়ে নেশা ধরেছেন আপনার বাবা তা জানতেন?'

'না, জানতেন না। সেদিনই প্রথম জানতে পারলেন। বাবা সাধারণত রাত বারোটার আগে কখনো বাড়ি ফিরতেন না। সেদিন কি কারণে দশটার আগেই ফিরে এসেছিলেন। বাড়ি এসে যখন জানলেন যে টুর্নামেণ্টে ফাইন্যাল খেলায় খেলতে শিবপুরে গিয়েছি তখনই বোধ হয় অনুমান করেছিলেন, ছেলে আজ তৈরী হয়েই বাড়ি ফিরবে। বৈঠকখানা ঘরে চুপচাপ বসেছিলেন আমারই অপেক্ষায়।'

শ্যামবাবু থামতেই ভোম্বলদা বললেন—'বোধ হয় খেলার রেজাল্ট জানবার আগ্রহেই বসেছিলেন!'

শ্যামবাবু একটুকরো আদা নুন মাখিয়ে মুখে দিলেন। গোঁপ-জোড়া একবার চুমড়ে নিয়ে বললেন—'টলতে টলতে দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরের উঠোনে পা রাখা মাত্র বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড়। আমি হুমড়ি খেয়ে উঠোনে পড়ে গেলাম। চুলের মুঠি ধরে আবার টেনে তুলে বাঁ হাতে বাঁ গালে আরেক চড়, ছিটকে পড়লাম দরজাটার উপর। মাথা ঠুকে গেল। মা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বলে সে-যাত্রা বেঁচে গেলাম। নইলে মারতে মারতে বোধ হয় আমাকে মেরেই ফেলতেন।'

ভোম্বলদা বললেন—'এই যে আপনি বললেন নেশা করার জন্যে আপনাকে প্রহার করেননি। তা হলে—'

শ্যামবাবু মুচকি হেসে বললেন—'কথাটা মিথ্যে বলিনি আমাকে ও-ভাবে মারতে দেখে মা প্রতিবাদ করে বললেন—'যেমন বাপ তার ছেলেও তো তেমনিই হবে।'

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বাবা বললেন—'তার মানে? আমার কি কোনোদিন পা টলছে দেখেছো? তোমার ছেলে কুলাঙ্গার, বংশের নাম ডোবাতে বসেছে।'

শ্যামবাবু গেলাসে আরেক চুমুক দিয়ে আদার কুচি মুখে ফেললেন। বললেন—'কিছু বুঝলেন ভায়া?'

ভোম্বলদা নীরব।

'বুঝলেন না তো? তা হলে শুনুন। বাবা রাগলে যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন আবার রাগ পড়ে গেলেই শিবতুল্য মানুষ। চানটান করে খেয়ে উঠেছি, বাবা তখনো বৈঠকখানা ঘরে চুপ করে বসে। হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন—শ্যাম, একবার এদিকে এসো। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকেছি, পাশের চেয়ারে বসতে বললেন। তখন বাবা অন্য মানুষ। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বসে আছি। বাবার মুখেও কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বাবা বললেন—খাও, আমি তাতে বাধা দেব না। কারণ, আমি নিজে যা করি অন্যকে তা না করবার উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে শোভা পায় না। তবে একটা কথা সব সময় মনে রেখো। মাতলামো করাটা আমি ঘৃণা করি, আর যতই খাও কোনোদিন পা যেন না টলে।'

শ্যামবাবু দশ আউন্সের বোতলের শেষটুকু আবার গেলাসে ঢাললেন, সোডার বোতলটায় হাত ছোঁয়ালেন না। চোঁ করে গেলাসটা নিঃশেষ করেই হাঁক দিলেন—'মোহন!'

কোথায় মোহন! একতলার টিনের শেড দেওয়া চত্বরটাতে তখন চেঁচামেচি, গালিগালাজ অজস্র বর্ষিত হচ্ছে। কে কার কথা

শোনে। তারি মধ্যে ভেসে আসছে হেঁড়ে গলায় কাওয়ালি গান। মুখটা যতখানি সম্ভব বিকৃত করে শ্যামবাবু বললেন—'এই মাতাল-গুলোকে আমি সহ্য করতে পারি না। ঝগড়াঝাঁটি গালাগালি না করা পর্যন্ত এই সব পেঁচির দল মনে করে তাদের বুঝি নেশাই হল না।'

এতক্ষণে শ্যামবাবু ভোম্বলদার 'দাদা' হয়ে গিয়েছেন, ভোম্বলদা ছোটো ভাই।

শ্যামবাবু আবার বললেন—'বুঝলেন ব্রাদার, দো আই অ্যাম এ মাতাল, আই হেইট মাতালস্।'

ভোম্বলদা দুই চোখ বিস্ময়বিস্ফারিত করে বললেন—'সে কী দাদা, আপনাকে মাতাল বলবে কে। চোখের সামনে দেখছি পুরো বোতল নীট পার করে দিলেন, অথচ জিভের এতটুকু জড়তা পর্যন্ত নেই।'

শ্যামবাবু শ্বেতশুভ্র গোঁপজোড়া আরেকবার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী দিয়ে চুমড়ে নিয়ে বললেন—'এটাও আমার সেই পিতৃদেবের শিক্ষা। সেই রাত্রির ঘটনা সব তো এখনো বলিনি, তবে শুনুন: বাবা আমাকে বললেন, ছাখ শ্যাম, দুটো কথা তোর কাছে আমার বলবার আছে। প্রথম কথা, মদের বোতল কি কখনো মাতাল হয়? হয় না। মদের বোতল কি কখনো টলে? টলে না। অথচ আকণ্ঠ মদ সেই বোতলে ভরা। সুতরাং যখনই নেশা করতে বসবি তখনই মনে মনে নিজেকে এই কথাই বোঝাবি যে, তুইও আকণ্ঠ মদ-ভরা বোতল। বোতল যেমন মাতাল হয় না, তুইও মাতাল হবি না। বোতল যেমন টলে না, তোরও কখনো পা টলবে না।'

এমন সময় মোহন একতলা থেকে ছুটতে ছুটতে এসেই হাঁক দিলে—'কার কি লাগবে তাড়াতাড়ি বলুন। নিচে হাজার ঝামেলা, আবার কখন উপরে আসতে পারব জানি না।'

শ্যামবাবুর দিকে তাকিয়েই মোহন বললে—'সে কি শ্যামবাবু,

আপনার সোডার বোতল যেমন-কে-তেমন পড়ে আছে যে।'

শ্যামবাবু বললেন—'সেই জন্যেই তো তোকে খুঁজছি। সোডাটা তো নষ্ট করতে পারি না, নিয়ে আয় আর দশ আউন্স।'

পকেট থেকে টাকা বার করে মোহনের হাতে দিয়েই শ্যামবাবু বললেন—'ভায়া যেন একটু হকচকিয়ে গেলে বলে মনে হচ্ছে। এটাও আমার বাবারই শিক্ষা। দ্বিতীয় যে কথাটা সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন আমার এই সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত সেই পিতৃবাক্য আমি লঙ্ঘন করিনি। তিনি বলেছিলেন—যখনই খাবি, মুখে ছোঁয়াবার আগে দু ফোঁটা মায়ের নামে উৎসর্গ করে খাবি। মনে মনে বলবি—মা, বিষটা তুমি নাও, অমৃতটুকু আমি পান করি। তাহলেই জানবি মা-ই তোকে রক্ষা করবেন।'

ভোম্বলদা বললেন—'আচ্ছা দাদা, দিনের পর দিন আপনি মাকে বিষ তুলে দিয়ে নিজে সুধা পান করছেন। কিন্তু একদিনও কি আপনার এ-কথা মনে হয়নি যে, সন্তান হয়ে মাকে বিষ খেতে বলাটা অপরাধ।'

ইতিমধ্যে মোহন ঝড়ের মতো এসে দুজনের সামনে দুটো বোতল রেখে ঝড়ের মতোই ছুটে চলে গেল। শ্যামবাবু গেলাসে খানিকটা ঢাললেন, সোডার বোতলে হাত ঠেকালেন না।

'কথাটা যা বলেছ ভায়া, লাখ টাকা দাম।' বলেই শ্যামবাবু গেলাসে চুমুক দিলেন।

'তবে কি জানো ভায়া, রামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে ঠিক এই উপদেশই দিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে গিরিশের মনে অনুশোচনা দেখা দিল—ছিঃ, কী স্বার্থপর আমি। মাকে রোজ বিষ খাওয়াচ্ছি। দিলে ছেড়ে মদ।'

ভোম্বলদা বললেন—'আচ্ছা দাদা, আপনার মনেও কি কোনো দিন এই অনুশোচনা দেখা দেয়নি?'

শ্যামবাবু বললেন—'রামপ্রসাদের সেই গানটা মনে আছে তো? সুরা পান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালি ব'লে।'

সত্তর বছরের বৃদ্ধ শ্যামবাবুর গলায় রামপ্রসাদী সুরের টপ্পার কাজ নিখুঁত বেরিয়ে এলো। ভোম্বলদার চোখে মুখে বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

গানটা থামিয়েই শ্যামবাবু বললেন—'কথাটা হচ্ছে মদ-মাতালে আমাকে মাতাল বললেও মন-মাতাল হতে পারাটাই তো আমার কাম্য। তাছাড়া মা হচ্ছেন সর্বংসহা। সন্তানের সব অত্যাচার সহ্য করেন, আবার সন্তানকে রক্ষাও করেন তিনিই।'

এতক্ষণে ভোম্বলদা মনে মনে শ্যামবাবুকে গুরুর আসনে বসিয়ে দিয়ে নিজে প্রায় সাধনমার্গের তূরীয় অবস্থায় এসে একেবারে 'ভোম্' মেরে গিয়েছেন, আর আউন্স দশেক পেটে পড়লে 'না' অবস্থায় পৌঁছে চরম মোক্ষলাভ।'

নিচে একতলায় চেঁচামেচি আরও বেড়েছে, দোকানের ছোকরা-গুলো তারস্বরে চীৎকার করে বলছে—'খেয়ে লেন, খেয়ে লেন, টাইম হয়ে এসেছে।'

হঠাৎ শ্যামবাবুর খেয়াল হল সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। নিচে যে রকম হট্টগোল শত ডাকলেও মোহনকে আর পাওয়া যাবে না। অথচ এ অবস্থায় সিগারেট না হলেই নয়। ভোম্বলদারও ঐ একই অবস্থা, প্যাকেট অনেক আগেই নিঃশেষ।

শ্যামবাবু বললেন—'বুঝলে ব্রাদার, সিগারেট না হলে তো আর কথা জমবে না।'

ভোম্বলদাকে তখন শ্যামবাবুর কথার নেশায় পেয়ে বসেছে। ভোম্বলদা বললেন— 'ঠিক বলেছেন দাদা, ধোঁয়া না হলে তো আর চলছে না। আমি নিজেই গিয়ে কিনে নিয়ে আসি।'

বাধা দিয়ে শ্যামবাবু বললেন—'না হে ব্রাদার, ও তোমার কম্মো নয়। তোমার অবস্থা যা দেখছি বেরোলে আর ফিরে আসতে

পারবে না। তার চেয়ে তুমি বসো, আমিই যাই। উড়ে যাব আর উড়ে আসব।'

কথাটা বলেই শ্যামবাবু টেবিল ছেড়ে উঠে সামনের খোলা জানলাটায় শরীর গলিয়ে দুই হাত ডানার মতো বিস্তার করে উড়লেন।

বাইরের ফুটপাথে প্রচণ্ড আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি হৈ-চৈ, ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল।

পরদিন হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে মাথা মুখ হাত পা সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শ্যামবাবুর ছ'ফুট শরীর অসাড় হয়ে পড়ে আছে। তখনো জ্ঞান ফেরেনি। ভোম্বলদা একাগ্রচিত্তে বিমর্ষ হয়ে অপেক্ষা করছেন কখন জ্ঞান ফিরবে।

ঘণ্টা তিন সময় পার হবার পর শ্যামবাবুর জ্ঞান ফিরল, জ্ঞান ফেরা মাত্র প্রথম প্রশ্ন করলেন—'এখন কোথায় আছি।'

আশ্বস্ত হয়ে ভোম্বলদা বললেন—'হাসপাতালে আছেন। এখন ভালো বোধ করছেন তো দাদা ?'

শ্যামবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন—'আমি হাসপাতালে কেন ?'

'আপনি জানলা দিয়ে উড়ে সিগারেট আনতে গিয়েছিলেন, সে-কথা আপনার মনে নেই ?'

'ও'—শ্যামবাবু নীরব। কিছুক্ষণ পর অনুশোচনার সুরে শ্যামবাবু বললেন—'বুঝলে ভায়া, তোমার পাল্লায় পড়ে প্রথম আমি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, তাই এই পদস্খলন। কিন্তু তুমি তো আমার সামনেই ছিলে, তুমি বাধা দিলে না কেন ?'

কাতরকণ্ঠে ভোম্বলদা বললেন—'মতিভ্রম ছাড়া আর কি বলব বলুন, আপনার কথা শুনে আমিও বিশ্বাস করে বসেছিলাম যে, সত্যি সত্যিই আপনি পেরে যাবেন।'

সেদিন থেকে যতদিন বেঁচেছিলেন শ্যামবাবু আর মদ স্পর্শ করেননি, ভোম্বলদাও মনের মতো গুরু পেয়েও হেলায় হারালেন।

৪

শ্যামবাবুর মতো গুরু হাতের কাছে পেয়েও হারানোর কাহিনীটি বলেই ভোম্বলদা একটা সিগারেট ধরালেন।

আজ মাস-পয়লা, মাইনে পাবার দিন। ভোম্বলদা বেয়ারা কেষ্টাকে তাগাদা মেরে বললেন—'যা তো কেষ্টা, একবার ক্যাশিয়ার বাবুর কাছে যা। মাইনেটা কখন দেবে একবার জেনে আয়। আজ আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, কথা দিয়ে এসেছি।'

কেষ্টা যাবার উদ্যোগ করতেই ভোম্বলদা আবার বললেন, 'আসবার সময় চার পেয়ালা চা নিয়ে আসিস। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে বকর-বকর করে গলা শুকিয়ে গিয়েছে।'

কেষ্টা চলে যেতেই বাদল বললে, 'আচ্ছা ভোম্বলদা, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব?'

ভোম্বলদা সিগারেটটায় একটা জোর টান দিয়ে বললেন, 'বলতে তোদের সঙ্কোচটা কিসের আর বলতে কি তোরা কোনোদিন কসুর করেছিস?'

কিঞ্চিৎ সাহস পেয়ে বাদল বললে, 'আপনার মুখে শ্যামবাবুর ঘটনাটা শুনে রূপদর্শীর পরিচিত ব্রজদার কথা মনে পড়ে গেল। শুনেছি ব্রজদাকে "মাষ্টার অব গুল" খেতাব দেবার জন্যে রাষ্ট্রপতির কাছে রেকমেণ্ডেশন গেছে। আমাদের ইচ্ছে, তার আগে আপনাকে আমরা ঐ খেতাবে ভূষিত করব।'

সঙ্গে সঙ্গে রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন হাত তুলে বললে, 'এ প্রস্তাবে আমরাও আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।'

ভোম্বলদা কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে বাদল রাখাল আর নরেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাতের সিগারেট হাতেই পুড়তে লাগল। অবশেষে মৌন ভঙ্গ করলেন ভোম্বলদা। ব্যথাতুর কণ্ঠে বললেন, 'ছি ছি ছি! মাছি-মারা কেরানির কাজ করতে করতে তোদের দেখছি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। কার সঙ্গে কার তুলনা! ব্রজদা হচ্ছেন বাঙ্গালীর গৌরব, রূপদর্শীর কল্যাণে আজ তিনি বাংলাদেশের যশোগাথা হয়ে বিরাজমান। তাছাড়া ব্রজদা ইজ টু গুড ফর দোজ খেতাবস্। ও-সব কাগজী সম্মান আর খেতাবের মুখে ব্রজদা ইয়ে করে দেন। দিতে হলে দেওয়া উচিত রূপদর্শীকে, যিনি ব্রজদাকে দেশবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেই কবে 'গুলবকাওলি" লেখা হয়েছিল তারপর এত বছর বাদে লেখা হল "ব্রজবুলি"। তবে তোদের ঐ 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে আমার আপত্তি আছে। সেকুলর স্টেট-এ ও-উপাধি অচল। তবে তোদের এম্. জি. মাস্টার অব গুল-ও চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্স-এ ওটা চালিয়ে দিতে পারিস। তার চেয়ে "গুল্মাবতার" উপধিটাই সমীচীন বোধ হচ্ছে।'

ভুরু কুঁচকে বাদল বললে, 'গুল্মাবতার ভোম্বলদা। কথাটা যেন কেমন কেমন শোনাচ্ছে!'

ধমক দিয়ে ভোম্বলদা বললেন, 'আমার নামের সঙ্গে ওসব উপাধি কি মানায়? ওটা ব্রজদার জন্যেই তুলে রাখ। তবে শুনে রাখ, ব্রজদারও দাদা আছে, তার কথা তো তোরা কিছুই জানিস না।'

এমন সময় বেয়ারা কেষ্টা চার কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকেই বললে, 'ক্যাশিয়ার বাবু বললেন টিফিনের পরে মাইনে দেবেন।'

ভোম্বলদা কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বিড় বিড় করে বললেন, 'ভেবেছিলাম আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরবো, তা আর হতে দেবে না দেখছি।'

বাদল উৎসাহিত হয়ে বললে, 'অত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কী করবেন। তার চেয়ে—'

'থাম থাম। ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ করিসনে। বে-থা তো করলিনি, ও-সব কি বুঝবি।' ভোম্বলদা চায়ে চুমুক দিলেন, মুখে বিরক্তির ছাপ।

ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন অনেক আগেই কলম গুটিয়ে ফেলেছে। ভোম্বলদার মুখে নতুন কিছু একটা ঘটনা শুনবার আশায় সে অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে ছিল। প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যে সে বললে, 'ব্রজদারও যে আবার দাদা থাকতে পারে এবং সে দাদা যে কী রকম দাদা, আমাদের তা কল্পনারও বাইরে।'

ভোম্বলদা বললেন, 'তোদের কল্পনার দৌড় তো আমার জানা আছে, তোদের এই ভোম্বলদা পর্যন্তই যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কে এনে দিয়েছে জানিস্‌?'

বাদল সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'সে আর কে না জানে। গান্ধীজী, জহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র।'

ভোম্বলদা চায়ের কাপে শেষ চুমুক মেরে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভোম্বলদা বললেন, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামীদের কথাই তোরা জানিস। কিন্তু আরেকজন ভারতবাসী, যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরোক্ষ কারণ, তাঁর কথা তোরা কিছুই জানলি না, এর চেয়ে বড় দুঃখের কারণ আর কি হতে পারে।'

ভোম্বলদার এই অভিযোগে সত্যিই লজ্জিত হয়ে পড়লো বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন।

ভোম্বলদা বললেন, 'এতে তোদের লজ্জিত হবার কারণ নেই। যার কথা বলছি তিনি আজ স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং এরকম সার্থকনামা লোক পৃথিবীতে কমই আছে। তাঁর পূর্বপরিচয় সকলেরই অজানা, তাই চট করে তাঁর নামটা মনে পড়বার কথা নয়।'

ভোম্বলদা দেয়াল-ঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন। বেলা সাড়ে এগারোটা, টিফিনের এখনো অনেক দেরি, তাঃপরে মাইনে। সুতরাং—

ভোম্বলদা সেদিন যে কাহিনী বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেনকে শোনালেন, তা আপনাদের কাছে বলা যাক।

ভোম্বলদা বললেন—জার্মান দেশ সম্বন্ধে একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, বার্লিনের রাস্তায় বেরিয়ে যদি তুমি একটা ঢিল ছোঁড়, হয় সেটা একটা ডগ-এর গায়ে লাগবে নয় তো একজন ডক্টরেটের।

আবার বিদেশীরা জার্মান দেশ সম্বন্ধে বলে—বার্লিনের রাস্তায় বেরিয়ে ইট ছুঁড়লেই ডকটরেট পাওয়া যায় অর্থাৎ গবেষণা করে একটি থান ইট ছাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ডকটরেট। তবে আজকাল তোদের কলকাতার অবস্থা যা হয়েছে বার্লিনকেও হার মানায়। প্রতিবছর গণ্ডায় গণ্ডায় ডকটর বেরোচ্ছে, তার ফলে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারে একাকার হয়ে কে যে কী, তা আর বোঝার উপায় নেই। কলকাতার রাস্তার কুকুরগুলোকে না ধরে যদি এই ডক্টরগুলোকে ধরতো তাহলে বাংলা দেশের ছাত্রদের কল্যাণ হত।

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ডক্টেরেটের এত ছড়াছড়ি ছিল না, আর তখনকার আমলে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট এত সহজলভ্য ছিল না।

সেই যুগের ভারতবর্ষেরই এক কৃতী সন্তান বহু পরিশ্রম করে বহু গবেষণার পর এক থীসিস্ তৈরী করলেন ডক্টরেটের জন্যে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে একেরপর এক ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর থীসিস্ সাবমিট করলেন, প্রত্যেকেই তা ফেরত পাঠালে। তাদের বক্তব্য, যে বিষয় নিয়ে এই থীসিস্, সে বিষয়টিকে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার বিষয়রূপে মর্যাদা দিতে অপারগ। অতএব দুঃখের সঙ্গেই তা নাকচ করা হল।

বিষয়টা ছিল একটু স্বতন্ত্র জাতের। অশোকের শিলালিপি, রবীন্দ্রকাব্যে সীমা ও অসীম বা প্রাচীন ভারতে শক্তিপূজা এইসব মামুলি বিষয় নয়। ভদ্রলোকের থীসিসের বিষয় ছিল গুল। যে বিষয়ের পারঙ্গমতার জন্য ব্রজদাকে তোরা উপাধি দিতে চাস কিম্বা আমাকে ডিগ্রী।

ইতিপূর্বে গুল নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। ভদ্রলোক পৃথিবীর সব দেশের প্রাচীন ও আধুনিক কালের গুলসম্পর্কিত তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ করে তার উপর ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনামূলক গবেষণা করেছিলেন, খুবই মূল্যবান গবেষণা।

কিন্তু তোরা তো জানিস, গুণীর আদর আমাদের দেশে অত সহজে হয় না।

বিদেশের লোক বাহবা না দিলে আমরা কখনো তার গুণ স্বীকার করি না। বেদ উপনিষদ বিদেশী পণ্ডিতদ্বারা গ্রন্থাকারে অনুবাদ না বেরলে আমাদের ধর্মের আকর গ্রন্থ দুটির কোনো মর্যাদাই আমরা দিতাম না। জার্মান মনীষী গ্যয়টে শকুন্তলা কাব্যকে মহৎ সৃষ্টি বলেছিলেন বলেই কালিদাসকে আজ আমরা মাথায় তুলে রেখেছি। নোবেল প্রাইজ না পেলে রবীন্দ্রনাথকে কি কেউ পাত্তা দিত? স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় বিশ্বধর্মসম্মেলনে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে মার্কিন মুলুককে সম্মোহিত করেছিলেন বলেই দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে আমরা গুরুর আসনে বসিয়েছি। এরকম কত উদাহরণ চাস।

গুল সম্পর্কে গবেষক এই ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিটির কপালে সেই একই লাঞ্ছনা জুটেছিল। ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রত্যাখ্যান করল তখন দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় ভদ্রলোক একদিন রাত্রে পেট্রোল ঢেলে তাঁর থীসিসের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলাই স্থির করলেন।

কিন্তু নিজের সৃষ্টিকে বিনষ্ট করা আপন হাতে নিজ সন্তানকে হত্যা করার সামিল। এই অপরাধ করার পূর্ব্বে কন্যাকুমারিকার

মন্দিরে গিয়ে প্রথমে পূজা দিলেন, তারপর কেপ-কমোরিনে ভারত-মহাসমুদ্রের কোলে সূর্যাস্ত দেখার বাসনায় শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন। বিষণ্ণ সন্ধ্যার করুণ আভা ছড়িয়ে পশ্চিম সমুদ্রে সূর্য অস্ত গেল। চারিদিকে আঁধার নেমে এসেছে, শিলাখণ্ডের উপর সমুদ্রতরঙ্গের মুহুর্মুহু আঘাত যেন বার বার করে তাকে বলছে—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।'

সহসা ভদ্রলোকের অন্তরে এক গভীর উপলব্ধি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সত্যিই তো, তাঁর দীর্ঘ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের ফল এ ভাবে বিনষ্ট করা উচিত নয়। এ-দেশে যদি না হয়, অন্য কোথা অন্য কোনো দেশে চেষ্টা করে দ্যাখো!

বাড়ি ফিরে এসে গবেষণার পাণ্ডুলিপি আপন সন্তানের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে সমস্ত রাত জেগে বসে রইলেন, দুই চোখে অবিরাম জলধারা।

পরদিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে বিগত রাত্রির সব গ্লানি মন থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। উনি জানতেন যে, ফরাসী দেশ ছিল ইউরোপের সংস্কৃতির কেন্দ্র, সে-দেশে সম্মানলাভ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা সমগ্র ইউরোপে আলোর মতো ছড়িয়ে পড়বে। সেইদিনই তিনি ফ্রান্সের সরবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর থীসিস্ পাঠিয়ে দিলেন ডক্টরেটের আবেদনপত্র সমেত।

মাস ছয় বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর এক পত্রে জানালেন তাঁর থীসিস্ গৃহীত হয়েছে, তিনজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কাছে তা পরীক্ষায় পাঠানো হল।

এই চিঠির পর একটা মাসও পার হয়নি, হঠাৎ এক কেব্‌ল এসে হাজির, অবিলম্বে তাঁকে প্যারিসে উপস্থিত হতে হবে।

পরের মাসেই প্যারিসে গিয়ে হাজির, আর হাজির হওয়া মাত্র তাঁকে নিয়ে লোফালুফি শুরু হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটি হল-এ বিরাট সম্বর্ধনা। ডীন অব ফ্যাকালটিজরা উপস্থিত, প্রফেসর রীডার

লেকচারার সবাই। ফরাসী দেশের সেরা পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে তাঁকে ডকটরেট দেওয়া হল এবং তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে পণ্ডিতরা একবাক্যে বললেন যে, এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক গবেষণা এর আগে আর কোনো ভারতবাসীর কাছ থেকে তাঁরা পাননি।

ফরাসী সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি। সভাপতির ভাষণে তিনি ফরাসী দেশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করলেন যে, এই ভারতীয় পণ্ডিতকে তাঁর মহামূল্যবান গবেষণা কার্যের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে আমি ও আমার দেশ ধন্য হতে চাই, এখন থেকে তাঁর উপাধি হল "মঁশিয়ে গুল-ফ্রাঁস"।

সঙ্গে সঙ্গে সে-দেশের সংবাদপত্রের যত রিপোর্টার আর প্রেস ফটোগ্রাফার ছেকে ধরল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, ছবির পর ছবি। পরদিন সকালে ফরাসী দেশের সবকয়টি দৈনিক কাগজে তাঁর ছবি লাইফস্কেচ এবং তাঁর থীসিসের বিষয়বস্তু নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা।

রাতারাতি সেই ভারতীয় ভদ্রলোক সারা ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ইউরোপের একটা মস্ত গুণ হচ্ছে যে, পণ্ডিত, শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক, নর্তকী প্রভৃতিকে নিয়ে মাতামাতি করতে এরা ভালবাসে। তাছাড়া এ নিয়ে ইউরোপে রেশারেশিও আছে খুব। সংস্কৃতির সমঝদারিতে এক দেশ আরেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে, তা কখনই হতে দেবে না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভারতীয় ডক্টর মঁশিয়ে গুল-ফ্রাঁসের আমন্ত্রণ এল ইটালীর রোম নগরীতে।

সেখানেও বিরাট সম্বর্ধনা,সেই সঙ্গে তাঁকে রাষ্ট্রীয় উপাধি দেওয়া হল "সিনর গুলোনিনি"।

ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ডক্টরেট সিনর গুলোনিনি এবার আমন্ত্রণ পেলেন জার্মানীর কাছ থেকে। বার্লিনে রাইখস্টাগের বিরাট সুউচ্চ বক্তৃতামঞ্চে তুলে সে-দেশের চ্যান্সেলার বললেন যে, জার্মান

জাতি এমন একজন গুণী ভারতীয়কে সর্বপ্রথম ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গভীরভাবে দুঃখিত। তথাপি আজকের এই মহতী জনসভায় বেদ ও উপনিষদ, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের দেশ থেকে আগত এই মহাজ্ঞানী পণ্ডিতকে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করা হল, ইনি আজ হলেন—"হের ফন গুলেন্‌বের্গ"।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বিদীর্ণ করে অগণিত জনতা তিনবার সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুললেন—হাইল ইণ্ডিস্কি, হাইল ডয়েশল্যাণ্ড, হাইল গুলেনবের্গ।

জার্মানীর পরেই এবার তাঁকে যেতে হল সোভিয়েট রাশিয়ায়, মস্কোর রেডস্কোয়ারে তাঁর বিপুল সম্বর্ধনা। ওদেশে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের সম্বর্ধনা না কি মাঠে-ময়দানে না করে উপায় নেই। জনতার চাপ এত বেশি যে, কোনো প্রশস্ত হলঘরে স্থান সংকুলান সম্ভব হয় না। ওদেশের জনতা শুধু কবির দর্শন লাভে বা আবৃত্তি শুনে সন্তুষ্ট নয়, তার কোটপ্যাণ্ট জুতো মোজা খুলে না নেওয়া পর্যন্ত জনতার ভক্তি-শ্রদ্ধার পুরো নিদর্শন নাকি দেখানো হয় না। সেই কারণে নিজেদের দেশের কোনো শিল্পীকে তারা রেডস্কোয়ারে ছাড়া অন্যত্র কোথাও সম্বর্ধনা দেয় না, ভারতীয় হলে তো কথাই নেই।

সেই রেডস্কোয়ারেই ভারতীয় ডক্টরের সম্বর্ধনা। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ, শুধু মাথার পর মাথা, তোড়ার পর তোড়া ফুল। মহামান্য স্তালিন ভারতীয় গুণীকে নিয়ে রোস্ট্রামে আরোহণ করা মাত্র সমবেত জনতার শত লক্ষ কণ্ঠ ধ্বনি তুলল—হো হো হো। স্তালিন ডান হাতে ভারতীয় ভদ্রলোকের বাম হস্তের কব্জি শূন্যে তুলে ধরে বললেন—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রথা অনুসারে আমরা এই ভারতীয় গুণীকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে নূতন নামে অভিষিক্ত করতে চাই। আজ থেকে তাঁর উপাধি হল – কমরেড গুলেন্‌কভ।

সঙ্গে সঙ্গে রেডস্কোয়ারের আকাশ বাতাস মুখরিত করে লক্ষ

লক্ষ জনতা তিনবার ফুলের তোড়াসমেত হাত শূন্যে নিক্ষেপ করে ধ্বনি তুলল—হো, হো, হো।

সভা ভঙ্গ হওয়ামাত্র সেই বিপুল জনতা আগে কেবা ফুল করিবেক দান তারি লাগি কমরেড গুলেন্‌কভের দিকে ধাওয়া করল। এবার বুঝি প্যাণ্ট কোট খুলে নিয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয় অতিথি, তাই পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে আসা সম্ভব হল না। পুলিশ বেধড়ক বেটন চালালে, কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, কত-লোকের মাথা হল ফাটা।

মস্কো সম্বর্ধনার সচিত্র সংবাদ প্রাভদা আর ইজভেস্তিয়ায় ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ পার্লামেণ্টের টনক নড়ল। কে এই ভারতীয়, যাকে নিয়ে সারা ইউরোপ এত সোরগোল তুলেছে! এমন কি সোভিয়েট রাশিয়া পর্যন্ত।

লেবার পার্টির ক্লিমেন্স এট্‌লি তখন প্রাইম মিনিস্টার। জরুরী কেবিনেট মিটিং ডাকলেন। সদস্যদের বুঝিয়ে বললেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক ভারতীয় প্রজাকে নিয়ে সারা ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি যে-ভাবে সম্মান জানাচ্ছে তাতে ভারতবর্ষকে তো আর পরাধীন রাখা চলে না। এতে বৃটিশ সরকারের প্রেস্টিজ অ্যাট স্টেক। রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে একবার আমেরিকার লোকরা বলেছিল —you are the reason why India should be free। এঁকে নিয়েও আবার তারা সেই একই স্লোগান তুলবে। তারা বলবে, যে-দেশে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নেহরু আর ডক্টর গুলফ্রাঁসের মত মনীষী জন্মায় এবং যে-দেশের এই সব মানুষকে নিয়ে সারা পৃথিবী এত সম্মান দেখায়, সেই ভারতবর্ষের মত সভ্যদেশকে পরাধীন রাখা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়।

ক্যাবিনেটের সদস্যরা একবাক্যে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লিকে সমর্থন জানিয়ে বললেন—হক কথা। ভারতবর্ষের মত সভ্যদেশকে বৃটিশ

সরকারের পদানত রাখলে বিশ্বের কাছে বৃটিশ সরকারের মান মর্যাদা গৌরব কিছুই বাড়বে না, পরন্তু হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে। ক্যাবিনেটে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এট্‌লি সঙ্গে সঙ্গে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠিয়ে রাতারাতি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা পাইয়ে দিলেন।

এদিকে সেই ভারতীয় ডক্টরেট তখন চীন দেশে গিয়ে উপস্থিত। তখনো মাও সে-তুং-এর রাজত্ব আসেনি, কুয়োমিনটাং-এর রাজত্ব। চিয়াং-কাই-শেকের আমন্ত্রণে সে-দেশে যাওয়া মাত্র চীন সেই ভারতীয় গুণীকে উপাধি দিলেন—গুলিয়াৎসেন। চীন দেশের মহান নেতা সানিয়াৎসেন নামের ঐতিহ্যবাহী এই পদবী তৎকালীন চীনের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু তখন ভারত-বর্ষের নন-অ্যালাইনমেণ্ট নীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের হর্তা-কর্তা কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে গভীর রাত্রে টেলিফোনযোগে গোপন শলা পরামর্শ চলছে।

আসল খবরটা জানিয়ে দিল কৃষ্ণ মেনন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির গোপন খবর। সেই সঙ্গে কৃষ্ণ মেনন নেহরুকে এটাও জানালেন যে, অবিলম্বে সেই ভারতবাসী ডক্টরকে দেশে ফিরিয়ে এনে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা আর সম্মান না দিলে স্বাধীন ভারতের মুখে চুনকালি পড়বে।

নেহরু চমকে উঠলেন। তাই তো! বিদেশে কে এক ভারতীয় ডক্টরকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ হচ্ছে এখবরটা তিনিও যেন বিদেশী কাগজে দেখেছেন বলে মনে হচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল তাঁর ভারতবর্ষে। একযোগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ।

ডক্টর গুলিয়াৎসেন তখন চীন থেকে জাপানে গিয়ে উপস্থিত। টোকিও শহরে রাজা হিরোহিতোর প্রাসাদে তখন বিরাট ভোজসভা।

জাপানের পক্ষ থেকে তাঁকে উপাধি দেওয়া হল ডক্টর গুলে-

কাওয়া। ভোজনপর্ব সমাধার পর নানা বর্ণের বসন ভূষণে সজ্জিতা জাপানী সুন্দরী গেইশারা নাচের আসরে আবির্ভূতা হয়েছেন এমন সময় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এসে জাপানী প্রথায় কাওটাও করে ডক্টর গুলেকাওয়ার হাতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি আর প্রধান মন্ত্রীর অভিনন্দন ও আমন্ত্রণ লিপি দিলেন। চিঠি পেয়ে ভারতীয় ডক্টর অভিভূত হয়ে গেলেন। এতদিন পরে দেশ তাঁকে স্মরণ করল! কিন্তু তখনো তাঁর কাছে আরো অনেকগুলি দেশের নিমন্ত্রণ এসেছে এবং তিনি তা গ্রহণও করেছেন। জানিয়ে দিলেন যে, নিজের দেশ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আর গৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে। তবে দেশে ফেরার আগে তিব্বত, পাকিস্তান ও ইরান হয়ে ভারতে ফিরবেন, সুতরাং আরো মাসখানেক সময় নেবে।

জাপান.থেকে প্রথমে গেলেন তিব্বতে। পাঞ্চেন লামার দরবারে তিব্বতের তাবৎ পণ্ডিতের সমাবেশ। চায়ের বাটিতে মাখনের ড্যালা ফেলে তাঁকে আপ্যায়িত করে উপাধি দেওয়া হল গুল্‌চেন্‌ লামা।

সেখান থেকে চলে এলেন পাকিস্তানে। করাচীর সমুদ্রোপকূলে পাকিস্তানের কবিকুল অনেক গজল আর শায়ের শোনালেন তাঁকে বরেণ্য অতিথির সম্মান দিয়ে। সেই সঙ্গে সে-দেশে তাঁর উপাধি হল—গুল্‌ মহম্মদ।

এবার যেতে হল গোলাপ আর বুলবুলের দেশ ইরানে। গোলাপ ফুলে সজ্জিত মঞ্চে বসিয়ে তাঁকে খেতাব দেওয়া হল গুলেন শাহ।

এতদিন পর বহু দেশ ঘুরে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হয়ে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পালা। ভারতের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে তাঁকে 'ডক্টর অনরিয়াস কজা' দেবার জন্য।

ভারতবর্ষে ফিরেই তিনি প্রথমেই চলে গেলেন কন্যাকুমারীর মন্দিরে। জগৎজোড়া সাফল্যের জন্য পূজা দিলেন, কেপ-কমো-

রিনের সেই শিলাখণ্ডের উপর বসে ধ্যানসমাহিত চিত্তে ভারতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার সঙ্কল্প নিলেন।

তারপর গেলেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজবাসী তাঁকে পেয়ে ধন্য হল। টাউন হলে বিচার সম্বর্ধনা সভায় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে 'অবিনাশী গুললিঙ্গম্' উপাধিতে ভূষিত করে বললেন—আপনি অগাধ গুণ-সম্পন্নই শুধু নহেন, অপার গুলসমুদ্রে আপনি নির্ভীক নাবিক। আপনাকে দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

মাদ্রাজের পাট চুকিয়ে তাঁকে যেতে হল রবীন্দ্রনাথের পীঠস্থান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আম্রকুঞ্জে সম্বর্ধনার আয়োজন, মন্দিরা-সহ আশ্রম-বালিকারা তিন পা-এগোনো দুপা-পিছোনো মনিপুরী নৃত্যে স্বাগত জানালেন এবং উপাচার্য ছাতিম গাছের পাতা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে উপাধি দিলেন—গুলিকোত্তম্।

এদিকে দিল্লীর দরবারে তখন সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি ভবন সংলগ্ন মোগল উদ্যানে সম্বর্ধনার বিরাট আয়োজন। ভি-আই-পিরা সস্ত্রীক ও সবান্ধবী আমন্ত্রিত, মোগল উদ্যানে প্রজাপতির হাট। দিল্লীতে যতগুলি আকাদমী আছে সবগুলির পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে উপাধি দেওয়া হল—গুল্মবিভূষণ।

শুধু সম্বর্ধনা আর উপাধি দিলেই তো হবে না, জগৎবরেণ্য এই মহামনীষীকে ভারতবর্ষের কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কাজে আটকে রাখা প্রয়োজন।

সঙ্গে সঙ্গে কেবিনেট মিটিং বসে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, লোকসভার উপনির্বাচনে হায়দ্রাবাদের গুলবার্গা থেকে দাঁড় করিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে তাঁকে বহাল করা হবে।

ভোম্বলদা থামলেন। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালেন। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন, দেড়টা বেজেছে। টিফিন পিরিয়ড শেষ, ক্যাশিয়ারবাবুর ডাক আসেনি।

অধৈর্য হয়ে ভোম্বলদা ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছেন আর পা নাচাচ্ছেন।

ওদিকে বাদল রাখাল আর ডেস্‌পাচ ক্লার্ক নরেন এতবড় একটা কাহিনী শুনে ভ্যাবাচাকা মেরে গিয়েছে। স্বনামধন্য ব্যক্তিটির নাম একবারও ভোম্বলদা উচ্চারণ করেননি অথচ নামটি জানবার আগ্রহে অধীর অপেক্ষায় তারা ভোম্বলদার মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

ওদের উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখে ভোম্বলদা নির্বিকার। পা নাচাচ্ছেন আর সিগারেট টানছেন, ধোঁয়া ছাড়ছেন আর পা নাচাচ্ছেন। অবশেষে ভোম্বলদাই মুখ খুললেন, বললেন, 'এই ভারতীয় ডক্টরটি কে, কিছু বুঝতে পারলি ?'

বাদল বললে, 'না ভোম্বলদা, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।'

ভোম্বলদার ঠোঁটে আবার সেই বাঁকা হাসি। বললেন, 'কেরানীর কাজ করে করে মাথাটা তো গোবরের সার করে বসে আছিস। বুঝবি কি করে।'

উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে না পেরে ডেসপাচ্ ক্লার্ক নরেন বললে, 'নামটা বলেই ফেলুন না দাদা, কেন আর আমাদের নিয়ে খেলাচ্ছেন।'

গম্ভীর গলায় ভোম্বলদা বললেন, 'তবে শোন। ওঁর নাম ডক্টর গুল্‌জারিলাল নন্দা।'

'এঁ্যা!' তিনজনেই একসঙ্গে আঁৎকে উঠলো।

ভোম্বলদা আবার বললেন, 'থীসিসটা কী নামে বই আকারে ছাপা হয়েছে জানিস ?'

'না তো',—তিনজনে একসঙ্গেই বলে উঠল।

ভোম্বলদা আবার ধমকের সুরে বললেন,'কিছুই তো জানিস না। ওদিকে স্বাধীন ভারতের নাগরিক বলে গর্ব করিস। চাকরির উন্নতি তোদের কোনোকালেই হবে না। ইণ্টারভিউ হলে ভাইভাভোসিতেই

গোল্লা। জেনে রাখ, ভবিষ্যতে কাজ দেবে। থীসিসটার নাম, 'ভারতবর্ষের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'।

এবার বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেনের মুখে আর রা নেই।

বেয়ারা কেষ্টা এসে খবর দিলে, ক্যাশিয়ারবাবু ডাকছেন মাইনে নেবার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ভোম্বলদা।

বাদল হঠাৎ বলে উঠল, 'ভোম্বলদা, আমরা মত পরিবর্তন করলাম। 'গুল্মাবতার' উপাধিটা ব্রজদাকে না দিয়ে আপনাকেই আমরা দেব।'

ঘর থেকে চৌকাঠ পার হয়ে করিডরে পা দিয়ে ভোম্বলদা বললেন, 'তোদের যা-ইচ্ছে তোরা কর। আমার এখন কথা বলবার সময় নেই।'

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ ভোম্বলদা আবার ফিরে এসে ইস্কুল-মাস্টারের মত প্রশ্ন করলেন, 'ঈশবস্ ফেবল্স-এর বাংলা কী হবে বলতে পারিস?'

বাদল সপ্রতিভ হয়ে বললে, 'এ আর শক্ত কি, ঈশপের গল্প, ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি।'

ভোম্বলদা খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'এই বিদ্যে নিয়ে জন্মেছিস বলেই তো তোদের এই হাল। ও কথাটার বাংলা তর্জমা হবে 'ঈশব গুল।' তোদের শিক্ষা অধিকর্তা শুনছি ইংরিজি কথার বাংলা পরিভাষা তৈরীর জন্য কমিটি বসিয়েছে, সেখানে পাঠিয়ে দিস। সরকারী কেরানীদের পরিভাষা পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিতে পারবে।'

ভোম্বলদা আর দাঁড়ালেন না। করিডর ধরে তাঁর দ্রুত পদধ্বনি মিলিয়ে গেল।

৫

ক্যাশিয়ারবাবুর কাছ থেকে মাইনে নিয়েই ভোম্বলদা আবার কী মনে করে ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

বাদল রাখাল আর ডেস্‌পাচ ক্লার্ক নরেন তখন সবে আরেক রাউণ্ড চা আনিয়ে গুলতানি করছে, তাদের আলোচনার বিষয় ছিল ভোম্বলদার গুল, যার জন্যে আজকের টিফিনের ছুটিটাই ওদের মাঠে মারা গেল।

হঠাৎ ভোম্বলদাকে ফিরে আসতে দেখে ওরা তিনজনেই চুপ মেরে গেল। ওদের মনে তখন একমাত্র আশঙ্কা এই যে, ভোম্বলদা যখন বাড়ি না গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন তখন আবার একটা গল্প ফেঁদে বসবেন। আর যদি তাই হয়, তা হলে তো সেদিনের মত কাজের দফা গয়া।

ভোম্বলদা কিন্তু সেদিকেই গেলেন না। এমন কি জমিয়ে গল্প বলতে হলে নিজের চেয়ারে জম্পেশ হয়ে বসা প্রয়োজন, সেদিকেও তাঁর কোনো উৎসাহ নেই।

একটা উদাসীন ভাব নিয়ে ভোম্বলদা পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বাদলের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—'এই নে বাদল, তোর সেই কুড়ি টাকা। খুচরো-খাচরা আরো দু-চার টাকা যা তোর কাছ থেকে নিয়েছি তা আর শোধ করতে চাইনে। সব ঋণ একেবারে শোধ করে দিলে ভোম্বলদাকে হয়তো তোরা ভুলেই যাবি।'

বেশ কিছুটা অবাক ও অপ্রস্তুত হয়ে বাদল বললে—'সে কী

ভোম্বলদা, টাকাটা আজই ফেরত দেবার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন!'

ভোম্বলদা মৃদু হেসে বললেন—'ভবিষ্যতের পথ খোলসা রাখবার জন্যেই টাকাটা ফেরত দিলাম। আবার প্রয়োজন হলে চাইব কোন লজ্জায়।'

নেশার প্রয়োজনে টাকা ধার চাওয়া ভোম্বলদার জন্মগত অধিকার, বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন তা জানত। ধার নিয়েই ভোম্বলদা একগাল হেসে বশংবদ হয়ে বলতেন—'বাঁচালি ভাই, তোরা আমাকে চিরঋণী করে রাখলি।' এবং ভোম্বলদার আর সব কথা এন্তের মিথ্যে হলেও এই একটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—তা একাধিকবার একাধিক জনের কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

টাকাটা বাদলের হাতে গুঁজে দিয়েই ভোম্বলদা যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বাদল বললে—'ভোম্বলদা, আজ হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?'

ভোম্বলদা সলজ্জ হেসে বললেন—'তোদের বৌদির কাছে কথা দিয়ে এসেছি যে, মাইনে পেয়েই সকলের ধার দেনা শোধ করে সোজা বাড়ি গিয়ে বাকি টাকাটা ওর হাতে তুলে দেব।'

ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন বরাবরই একটু ঠোঁট-কাটা। দুম্ করে বলে বসলো—'যাক, এতদিনে ভোম্বলদার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে।'

অন্যদিন হলে নরেনের কথায় ভোম্বলদা ফোঁস করে উঠতেন। আজ কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব। কোনো উষ্মা প্রকাশ না করে শুধু বললেন—'শুভবুদ্ধি কি সাধে হয়েছে, গুঁতোর চোটে হয়েছে।'

গুঁতোটা যে কোত্থেকে কি ভাবে এসেছে তা বাদল রাখাল আর ডেসপাচ ক্লার্ক নরেন শুনেছিল। শুনেছিল শালুকের সেই মুরারীর কাছেই। নেশা করে ভোম্বলদা নিত্যি টাকা ওড়াচ্ছেন

আর ওদিকে ভোম্বলদার স্ত্রী সারা মাস পাড়াপড়শীদের কাছে চাল ডাল তেল মুন এমন কি আলু বেগুন ধার করে দু বেলা উদরান্নের ব্যবস্থা করেন। শত অভিযোগেও ভোম্বলদার সে-বিষয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পাড়ার লোকরা বিরক্ত, ওদিকে পাড়ার ক্লাব 'শক্তি সংঘ'র ছেলেরা মুখিয়ে আছে ভোম্বলদাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে।

তারা জানতো আজ ভোম্বলদার মাইনে পাবার দিন। আপিসে বেরোবার সময় বড় রাস্তার মোড়েই শক্তি সংঘের আস্তিন গোটানো হুদো-হুদো ছেলেরা ভোম্বলদাকে ঘিরে ধরলে। তারা শাসিয়ে দিলে যে, আজ মাইনে নিয়ে বাসি মুখে সোজা বাড়ি এসে বৌদির হাতে সব টাকা তুলে দিতে হবে। ব্যতিক্রম হলে রক্ষা নেই।

আজ আপিসে এসেই মুরারী এই সব খবর দিয়ে রেখেছিল বাদল রাখাল আর নরেনের কাছে। ভোম্বলদার মুখে গুঁতোর কথা শুনেও ওরা চুপ করে রইল, কোনো মন্তব্য করল না।

ভোম্বলদা বললেন—'জানিস, আজ আপিসে আসবার সময় বাস্‌টা যখন ঠিক মাঝ গঙ্গায় এসেছে তখন মনে মনে মা গঙ্গার কাছে এই বলে মানত করলুম, মা গঙ্গা, আজ যদি ভালোয় ভালোয় তোমার বুকের উপর দিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে পারি তাহলে তোমার কোলে পাঁচ টাকা সোয়া পাঁচ আনা বিসর্জন দিয়ে তোমার আশীর্বাদ চাইবো যেন আজ থেকে কোনো পাপ আমাকে স্পর্শ না করে।'

ভোম্বলদা শান্ত গম্ভীর গলায় কথাগুলি এমনভাবে বললেন, যেন একটা কঠিন সংকল্পবাক্য হয়ে অন্তর থেকে স্বতস্ফূর্ত নির্গত হল।

ভোম্বলদা আর অপেক্ষা করলেন না। বললেন—'যাই, দারোয়ান অনেকগুলো টাকা পাবে, পানওয়ালাও। ওদের দেনাটা চুকিয়ে দিতে পারলে আমি প্রায় মুক্ত পুরুষ।'

ভোম্বলদা চলে গেলেন। যাবার আগে শুধু বলে গেলেন—'কাল থেকে দেখিস, তোদের ভোম্বলদা অন্য মানুষ।'

দারোয়ান আর পানের দোকানে পুরো পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে যখন রাস্তায় বেরোলেন তখন তাঁর পকেটে অবশিষ্ট আছে আর মাত্র ত্রিশটা টাকা। মনকে দৃঢ় করে ভোম্বলদা চলেছেন হাওড়া পুলের দিকে, কোনোরকমে শাল্‌কে পৌঁছে স্ত্রীর হাতে টাকাটা তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত।

একাগ্রচিত্তে চলেছেন ভোম্বলদা। কোনো দিকে তাকানো নয়, পাছে প্রলোভন এসে মনকে দুর্বল করে দেয়। কাতারে কাতারে লোক চলেছে রাস্তা দিয়ে, কারো মুখের দিকে তাকানো নয় পাছে হাতছানি দেয় পথভ্রষ্ট হবার।

ফুটপাথের উপর নিবিষ্ট দৃষ্টি মেলে ভোম্বলদা চলেছেন—এবং যেতে যেতে মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছেন :

'মন, তুমি সংকল্পে অবিচলিত থেকো। মদ মোহ মাৎসর্যকে জয় করা চাই, কোনো প্রলোভনেই তুমি দুর্বল হয়ো না।'

ভোম্বলদা হন্ হন্ করে চলেছেন, যেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছন ছাড়া তাঁর সেই চলার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

কখন যে স্ট্র্যাণ্ড রোড হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে গিয়েছেন সে খেয়াল ছিল না ভোম্বলদার। সামনেই হাওড়ার পুল। মাঝ গঙ্গায় এসে মা গঙ্গার কাছে পাঁচ টাকা সোয়া পাঁচ আনা মানত করেছিলেন, সে কথা ভোলেননি ভোম্বলদা। একটা খুচরো পাঁচটাকার নোট তার জন্য আগেই আলাদা করে ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছেন।

এবারে রাস্তা পার হতে হবে। স্ট্র্যাণ্ড রোডের পূর্ব দিক ছেড়ে পশ্চিম দিকে।

ভোম্বলদা আরেকবার মনকে বললেন—'মন, তুমি সংকল্পে অটল থাকো। রাস্তা পার হলেই তুমি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব

করবে, ভাটিখানার আকর্ষণ। সে-আকর্ষণকে তোমার উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে, চরৈবেতি।'

কঠোপনিষদের কঠিন বাক্য মনে মনে জপ করতে করতে ভোম্বলদা রাস্তা পার হলেন। পশ্চিম দিকের ফুটপাথে পড়েই ভোম্বলদার মনে পড়ে গেল দেশী মদের ভাটিখানায় ওর কিছু দেনা আছে। ভোম্বলদা ওই দোকানের বহু পুরোনো মক্কেল। বুড়ো রামরতন সিং আজ তিরিশ বছর ঐ দোকানে কাজ করছে। লোক সে চেনে। কে সাচ্চা আর কে মেকী দু'চার দিনের কথাবার্তায় আচার আচরণে সে বুঝে ফেলে। ভোম্বলদা দোকানের পুরোনো খদ্দের, মালিক থেকে চাকর বেয়ারা সকলেরই তিনি আপনার জন। সময়ে অসময়ে তাই দু' চার টাকা বাকি রাখতে ভোম্বলদার কোনো দিনই অসুবিধা হয়নি। এই রামরতনের কাছেই পাঁচটাকা বাকি রেখেছিলেন ভোম্বলদা। ধার দিতে রামরতন সব সময় প্রস্তুত, ধারের অঙ্কটা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তেই থাকে। তাছাড়া রামরতন জানে, নেশাখোর লোকেদের দুটো জায়গায় একদিন না একদিন আসতেই হবে। এক ভাটিখানায়, পরে শ্মশানে! সুতরাং ধার শোধ না করে পার পাবার কি উপায় আছে?

ভোম্বলদা স্থির করেছেন শত্রুর শেষ যেমন রাখতে নেই, ঋণের শেষও তিনি আজ রাখবেন না। যা পাওনা সব চুকিয়ে দিয়ে ভোম্বলদা লোটাকম্বল নেবেন।

শান-বাঁধানো ফুটপাথটার উপর দাঁড়িয়ে ভোম্বলদা আবার মনকে বোঝালেন—'মন, তুমি সবল হও। কঠিন কর্তব্য তোমার সামনে, কঠিনতম পরীক্ষা। প্রলোভনকে জয় করার দুরূহ পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।'

উপনিষদ ছেড়ে এবার গীতার শ্লোক মনে মনে আওড়াতে লাগলেন ভোম্বলদা। দুর্বলচিত্ত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই ভাবেই ভোম্বলদা নিজের মনকে শক্তি সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।

অবশেষে সংকল্পে স্থিরনিশ্চিত হয়ে ভোম্বলদা ঢুকে পড়লেন ভাটিখানায়। দোকানে ঢোকামাত্র মালিক থেকে শুরু করে ছোকরা চাকরগুলো পর্যন্ত সেলাম ঠুকে ভোম্বলদাকে অভ্যর্থনা জানালে। কোথা থেকে বৃদ্ধ রামরতন সিং গামছা হাতে ছুটে এসে একটা খালি বেঞ্চি আর টেবিল মুছে সাফ করতে লাগল।

ভোম্বলদা পর্বতের মত অটল অচল। বসবার কোনো আগ্রহই প্রকাশ করলেন না। গম্ভীরগলায় শুধু বললেন—'রামরতন, কত টাকা তুমি আমার কাছে পাবে?'

কথাটা যেন রামরতনের কানেই যায়নি। সে শুধু বললে, 'কি দেব? পাঁট না বোতল।'

'কিছুই দিতে হবে না, তুমি কত পাবে তাই বল।' ভোম্বলদার কণ্ঠস্বরে যেন বজ্রের গাম্ভীর্য।

অবাক হয়ে রামরতন ভোম্বলদার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেলে সে শুধু বললে—'হুমার পাওনা টাকার জন্য ভাবছেন কেনো? পহলে আরাম করুন, খানাপিনা করুন, রুপয়া কা বাত পিছে হোবে। আজ কী আনিয়ে দেবো, কোস্‌সা মান্‌সো না পিয়াজু।'

ভোম্বলদা বেশ একটু রুক্ষস্বরেই বললেন—'ও সব কিছুই তোমাকে করতে হবে না। শুধু কত টাকা তোমার পাওনা সেইটাই বল।'

রামরতন এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল। গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো কথা না বলে গামছাটা কাঁধে ফেলে কাউন্টারে চলে গেল। একটা গ্লাস আর একটা সোডা এনে ভোম্বলদার সামনের টেবিলে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে বললে, 'বাবুজি, আপনার মেজাজ আজ বিলকুল গড়বড় হোইয়েছে। আপনি আরাম কোরে ধীরে ধীরে আইস্তে আইস্তে খান। মেজাজ শরিফ হোনে সে বাদ রুপয়া কা বাত।'

নিবেদন করে যে-পথ দিয়ে এসেছিলেন সে-পথেই আবার ফিরে গেলেন সেই ভাটিখানায়। আবেগজড়িতকণ্ঠে তিনি তখন স্বামী বিবেকানন্দ রচিত গান ধরেছেন—'মন চলো নিজ নিকেতনে।'

তারপর দিন থেকে ভোম্বলদা নিরুদ্দেশ, কেউ কোনো খোঁজ তাঁর পায়নি।

৬

ভোম্বলদাকে তার পর থেকে সত্যিই আর দেখা যায়নি। সুতরাং ভোম্বলদাকে নিয়ে আরো কিছু কাহিনী যে আপনাদের শোনাবো তার আর উপায় নেই। শুনেছি, চাকরি সংসার—অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে শ্মশানচারী হয়েছেন, কিন্তু কোন শ্মশানে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন তার হদিস কারো জানা নেই।

সবার উপরে মানুষ সত্য কথাটা যেমন নিখাদ সোনার মতো খাঁটি, তেমনি সবার উপরে মানুষ বিচিত্র, এই কথাটাও আজকের দিনে কিছু খাদ-মেশানো সোনার মতোই খাঁটি—যা দিয়ে ইচ্ছেমতো গালিয়ে গড়ে পিটে নানান রকমের নক্‌সা তোলা যায়। ভোম্বলদার কথা যা শুনেছি তার থেকে এইটুকুই সার সত্য আমি বুঝেছিলাম যে, এই বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ভোম্বলদা সেই কিছু খাদ-মেশানো খাঁটি সোনার মানুষ। এ ধরনের মানুষ সংসারে বিরল। কেননা প্রবঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যা আর কুটিলতায় ভরা আজকের জগতে এঁরা টিকে থাকতে পারেন না, নেপথ্যে সরে যেতেই হয়।

ভোম্বলদাকে আমি চাক্ষুষ দেখিনি, শুধু তাঁর গল্পই শুনেছি। এবার আমি আরেকজন বিচিত্র মানুষের কথা বলব যাঁকে আমার চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার ছাত্রজীবনে। আমি তাঁরই কথা এবার আপনাদের শোনাবো।

১৯৩১ সালের কথা। ম্যাট্রিক পাশ করে আমি তখন শান্তি-নিকেতন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। আমাদের পড়াবার জন্য একজন ইংরিজি অধ্যাপকের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অধ্যাপকের প্রয়োজন তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল একজন খেলাধূলায় পারদর্শী অধ্যাপকের, যাঁকে দিয়ে এক ঢিলে দু পাখিই মারা চলবে। বিশ্ব-ভারতীর তখন ছিল দৈন্যদশা, আজকের মত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার রমরমা তখন ছিল না। বিশেষ করে ছোট ছেলেদের ফুটবল খেলা শেখানোর জন্য একজন ইনস্ট্রাকটারের অভাব ছিল খুবই। সুতরাং এমন একজন ইউনিভার্সিটির সদ্য পাশ করা অধ্যাপকের খোঁজ করা হচ্ছিল যিনি ইস্কুলের ছাত্রদের ফুটবল খেলায় কোচ-এর কাজও করতে পারবেন।

অবশেষে সত্য সত্যই একজন ইংরাজিতে সদ্য এম-এ পাশ করা অধ্যাপক পাওয়া গেল, যিনি তাঁর আবেদনপত্রে অতিরিক্ত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এই বলে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন তিনি ওয়াই-এম-সি-এ ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন একাধিক বৎসর এবং তাঁর অধিনায়কত্বে একাধিকবার তাঁর দল টুরনামেণ্টে-এ শীল্ড ও কাপ বিজয়ী হয়েছে।

যেমনটি চাওয়া হয়েছিল তাই পাওয়া গেল। একেবারে সোনায় সোহাগা। এমন একজন গুণী অধ্যাপকের আগমন সংবাদে আমরা উৎসুক হয়ে আছি, ইস্কুলের ছাত্রমহলে তাঁর সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

গ্রীষ্মের ছুটির পর জুলাই মাসে স্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অধ্যাপকটি কাজে যোগ দিলেন এবং যথারীতি আমাদের ক্লাস নিতে শুরু করলেন। তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণ। যেমন স্বাস্থ্যবান তেমনি সুপুরুষ। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে চেহারাতেই মালুম দিয়েছিল, হ্যাঁ, স্পোর্টস-ম্যান-লাইক চেহারাই বটে।

ইতিমধ্যে ইস্কুলের ছেলেদের মুখে মুখে তাঁর স্পোর্টসম্যানশিপ

সম্পর্কে অনেক কাহিনীই ছড়িয়ে পড়েছে। একবার ডাণ্ডাজ হোস্টেলের সঙ্গে ওয়াই-এম-সি-এর শীল্ড ফাইন্যাল খেলা। হাফ টাইম হয়ে গেছে, তখনও ওয়াই-এম-সি-এ দু গোলে হারছে। মাঠের বাইরে সমর্থকদের মধ্যে তখন হায়-হায় চিৎকার। সেদিনের খেলার ক্যাপ্টেন ছিলেন আমাদের এই নবাগত অধ্যাপক। রাইট ব্যাকে খেলছিলেন। নিজ দলের অবধারিত পরাজয়। খেলা শেষ হতে আর দশ মিনিট বাকী। হঠাৎ দেখা গেল সেণ্টার ফরোয়ার্ডের সঙ্গে জায়গা বদল করে ফেললেন এবং চোখের নিমেষে সেণ্টার হাফকে বল কাটিয়ে দু-দুটো ফুল ব্যাককে ড্রিবিল করে বল গোল লাইনের মধ্যে এনে বাঁ-পায়ে বুলেটের মত সট করলেন, গোলকীপার বুঝতেই পারল না কখন কীভাবে বল নেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পর পর তিনটি গোল—হ্যাট্রিক। শেষ গোলটা দিয়েছিলেন দেখবার মত। একেবারে পটে আঁকা ছবি। খেলার ফল তখন টু-অল, শেষ হতে আর এক মিনিট বাকি। লেফট্ আউটকে একটা থ্রু-পাশ দিয়েই ইসারা করলেন বলটা উঁচু করে পেনালটি এরিয়ার মধ্যে ফেলতে। বলটা রামধনুর মতো বেঁকে এসে পেনালটি এরিয়ায় পড়তে না পড়তেই কোত্থেকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে মাটি থেকে শূন্যে প্রায় তিনফুট লাফিয়ে উঠেই মাথাটা ঘুরিয়ে এমন হেড করলেন যে, বলটা ট্যান্‌জেণ্ট হয়ে গোলপোস্টে ঢুকে গেল, অপর পক্ষের ব্যাক আর গোলকীপার শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কাণ্ডটা দেখল।

সকালে ক্লাসে অধ্যাপকের পোশাকে ধুতি পাঞ্জাবীর উপর কাঁধে চাদর ঝুলিয়ে ইংরিজি পড়াতেন, পড়ানোটা এমন কিছু আহা-মরি গোছের ছিল না এবং আমরা তা আশাও করিনি। বিকেলে ফুটবল মাঠে স্পোর্টস্‌ম্যানের সাজে যখন এসে দাঁড়াতেন তখন তাঁর আরেক রূপ। হ্যাফ প্যাণ্ট, গায়ে জার্সি, পকেটের উপর ওয়াই-এম-সি-এর ইনসিগনিয়া। দুই পায়ের অ্যাঙ্কলেট্ নী-কাপ চেহারার জৌলুস

আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গলায় ব্রেসলেট-এর মতো দুলছে, কালো সিল্কের কর্ডে বাঁধা হুইসল্।

মাঠে নিয়মিত যেতেন, কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে নিজে কখনো খেলতেন না। অতবড় প্লেয়ার, বাচ্চাদের সঙ্গে কী খেলবেন। তবে যতক্ষণ ছেলেরা খেলত ততক্ষণ মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়, খেলার শেষে কার খেলার কী ত্রুটি তা আধঘণ্টা ধরে লেকচার দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন।

সকালে ক্লাসে তাঁর ইংরিজি পড়ানোর পদ্ধতিতে যদিও আমাদের ঘুম পেতো, কিন্তু বিকেলে খেলার মাঠে তাঁর খেলা শেখানোর লেক্চার শুনে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠতাম।

সে সময়ে বীরভূম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন দলের মধ্যে ফুটবল টুরনামেণ্ট হতো। এই টুরনামেণ্টে শান্তিনিকেতন টীমের সঙ্গে সিউড়ি টাউন ক্লাবের রেষারেষি ছিল সবচেয়ে বেশি। কোনো বছর সিউড়ি টাউন ক্লাব কাপ পেত, কোনো বছর শান্তিনিকেতন টীম। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতন ফুটবল টীম গড়ে উঠেছিল অধ্যাপক কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে এবং বাইরের কোনো দলের সঙ্গে যখনই খেলা থাকত তখন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন তাঁদের কলকাতা থেকে বিশেষ আমন্ত্রণে ডেকে আনা হতো। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশন লীগের খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে ডাক এলে কলকাতায় যত জরুরী খেলাই থাক না কেন, সানন্দে শান্তি-নিকেতনে চলে আসতেন। তাঁদের আগমনে শান্তিনিকেতনের ছাত্রমহলে সাড়া পড়ে যেত, স্কুলের ছেলেরা সদাসর্বক্ষণ তাঁদের সেবার কাজে হামেহাল হাজির। কেউ স্নানের জল এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ করছে খাওয়া-দাওয়ার তদারকী। আবার কেউ জার্সি আর প্যাণ্ট নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রি করে রেখেছে যাতে কোথাও

কোনো ত্রুটি না থাকে। কলকাতা থেকে আগন্তুক খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সূর্য চক্রবর্তী। সূর্যদা শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন খুব সম্ভবত ১৯১২।১৩ সালে। ছাত্রা-বস্থায় তাঁকে দেখার সৌভাগ্য যদিও আমাদের হয়নি কিন্তু পরবর্তী-কালে প্রতি বৎসর ফুটবল মরশুমে তিনি শান্তিনিকেতন টীমের হয়ে খেলতে আসতেন এবং তাঁর আগমন এবং খেলা দেখা ছিল আমাদের পরম প্রত্যাশা। সূর্যদা তখন কলকাতার ইস্টবেঙ্গল টীমের লেফট্-আউটে দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়, সারা বাংলাদেশজোড়া তাঁর নাম।

বেঁটে খাটো রোগা মানুষটির পায়ে একবার বল পড়েছে কি রক্ষে নেই। আউট-লাইন দিয়ে তীরবেগে বল নিয়ে যখন ছুটতেন তখন কার সাধ্যি তাঁকে আটকায়। সূর্যদা ছাড়াও তখন কলকাতা থেকে আসতেন বিশ্বনাথদা, বীরেনদা, সরোজদা। সারা আশ্রম মেতে উঠতো এঁদের নিয়ে।

আমি যে বছরের ঘটনার কথা বলছি সেবার সিউড়ি ক্লাবের সঙ্গে ফাইনাল খেলা হবে শান্তিনিকেতন দলের এবং শান্তি-নিকেতনের ফুটবল মাঠেই সে-খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সাজ সাজ রব পড়ে গেল। শান্তিনিকেতন ফুল টীমের খেলোয়াড়দের নিয়মিত প্র্যাকটিস শুরু হয়ে গেল, ওদিকে চিঠি আর টেলিগ্রাম চলে গেল সূর্যদা, বিশ্বনাথদা, সরোজদা আর বীরেনদার কাছে। এদিকে আমাদের ইংরিজির অধ্যাপক প্রতিদিন বিকেলে মাঠে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রদের বোঝাতে লাগলেন যে, এটা তো ইণ্টার-স্কুল বা ইণ্টার-ডিপার্টমেণ্ট খেলা নয়, এটা বাইরের দলের সঙ্গে কাপ টুরনামেণ্ট। সুতরাং এই ধরনের খেলায় খেলোয়াড়দের মনোবল, মেজাজ, দলগত ঐক্য ও সংকল্পে দৃঢ়তা কী ভাবে রক্ষা করে খেলতে হবে। আজও আমার মনে আছে, তিনি বলেছিলেন—'রামকৃষ্ণদেব ছাত্রদের বলতেন, কালি কলম মন, লেখে তিন জন। আমি খেলোয়াড়দের বলব, দৈহিক পটুত্ব, ক্রীড়াকৌশল আর মন, খেলে তিন জন।'

খোলোয়াড় ছাত্রদের মধ্যে বিতরিত তাঁর এই ধরনের নানা আপ্ত-বাক্য বেদবাক্যের মতো ছাত্রদের অন্তরে গাঁথা হয়ে থাকত।

খেলার দিন বেলা এগারোটায় কলকাতার গাড়ি বোলপুর স্টেশনে আসামাত্র উৎসাহী দল কামরা থেকে তাঁদের বহুপ্রত্যাশিত বীরেনদা, সরোজদা, আর বিশ্বনাথদাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নামিয়ে আনল। ছেলের দলের কেউ নিয়েছে বীরেনদার সুটকেশ্. কেউ বিশ্বনাথদার হ্যাণ্ডব্যাগ, কেউ সরোজদার জিনিসপত্র। কার জন্য কে কতটুকু করবে, তার জন্য ছেলেদের মধ্যে সেই বোলপুর স্টেশন থেকেই কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তারা জানে শান্তিনিকেতন দলের হার-জিৎ মান-সম্মান নির্ভর করছে কলকাতা থেকে আগত এই চার-জন প্রাক্তনীর উপর। ব্যাকে বীরেনদা, সেণ্টার হাফে বিশ্বনাথদা, রাইট আউটে সরোজদা আর লেফট্ আউটে সূর্যদা—ইস্টবেঙ্গল-খ্যাত সূর্য চক্রবর্তী।

কিন্তু সেই সূর্যদা কোথায়! তিনি তো এ গাড়িতে এলেন না! ছেলের দল সূর্যদাকে দেখতে না পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। ছেলের দলকে আশ্বাস দিয়ে বীরেনদা বললেন—তোরা কিছু ভাবিস না। তোদের সূর্যদা ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে কুচবিহারে খেলতে গিয়েছে। আজই বেলা দুটোর ট্রেনে পৌঁছে যাবে।

বীরেনদার আশ্বাসবাণীতে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলের দল শান্তিনিকেতনের পথে হেঁটে রওনা হল। সে সময়ে বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন—এই দেড় মাইল পথ সাধারণত কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে হেঁটেই চলে আসতেন। তখন না ছিল মোটর গাড়ি, না ছিল সাইকেল রিকশা। দু-একটা গোরুর গাড়ি থাকতো দূর গ্রামের যাত্রীদের নেবার জন্য।

বোলপুর শহরটা পার হতেই বীরেনদা ছেলের দলকে বললেন—ওরে তোরা গান ধর। সেই গানটা, মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত ছেলের দল সমস্বরে গান ধরল—

'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি ভাই।
—তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।'

বীরেনদা, বিশ্বনাথদা আর সরোজদাকে নিয়ে ছেলের দল গান গাইতে গাইতে আশ্রমের কাছে যখন এসে পৌঁছেছে, সেখানেও একদল ছাত্র এঁদের অভ্যথনা জানাবার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সূর্যদাকে দেখতে না পেয়ে সবাই হতাশ।

বেলা তুটোর সময় বোলপুর স্টেশন থেকে আর-একদল ছেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তুঃসংবাদ জানাল যে, সূর্যদা আসেননি। এর পরে সেই সন্ধ্যা ছাড়া আর কোনো গাড়ি নেই। সূর্যদাকে আজকের খেলায় পাবার আর কোনো সম্ভাবনাই রইল না।

ক্রমে ক্রমে সেই তুপুরেই সারা আশ্রমে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল, সূর্যদা আসতে পারেননি। সকলেরই চোখে মুখে এক প্রশ্ন— তা হলে এখন উপায়?

বেলা সাড়ে চারটায় খেলা আরম্ভ। হাতে আর মাত্র ঘণ্টা দেড়েক সময়। এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলতে হবে সূর্যদার জায়গায় কাকে নামানো যায়। বীরেনদা সরোজদা আর বিশ্বনাথ-দার সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ চলতে লাগল; কনফারেন্স বসে গেল ছাত্র-পরিচালক আর মাস্টার মশাইদের মধ্যে, ক্রীড়া সম্পাদক একটি সাইকেল নিয়ে চতুর্দিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন পরামর্শের জন্য। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে পরামর্শের জন্য যেতেই তিনি, খেলোয়াড়-দের যে তালিকা তৈরী করেছিলেন, ছাত্র-পরিচালক তা দিলেন নাকচ করে। তাঁর দেওয়া খেলোয়াড়-তালিকা যখন বীরেনদা, বিশ্বনাথদা আর সরোজদাকে দেখানো হল তাঁরা তিন জনই মাথা নেড়ে বললেন—তা কেমন করে হয়।

সূর্যদার অনুপস্থিততে এই রকম একটা অচল অবস্থার যখন সৃষ্টি হয়েছে ঠিক সেই সময় শিশু বিভাগের ছাত্ররা দল বেঁধে

বীরেনদা, বিশ্বনাথদা আর সরোজদার কাছে এক আবেদন নিয়ে হাজির।

তাদের সম্মিলিত অনুরোধ, কলকাতা থেকে সদ্য আগত কলেজের ইংরিজি অধ্যাপক বেণুদাকে আজকের খেলায় সূর্যদার বদলে যদি নামানো হয় তাহলে ক্যালক্যাটা সিটি ক্লাবের সাধ্য নেই শান্তিনিকেতন টীমকে হারায়, সিউড়ি টাউন ক্লাব তো কোন ছাড়। তাদের প্রস্তাবের সমর্থনে তারা তাদের বেণুদার ফুটবল খেলার কৃতিত্বের একটার পর একটা রোমাঞ্চকর উদাহরণ তুলে ধরতে লাগল। বিশেষ করে ডাণ্ডাজ হোস্টেলের বিরুদ্ধে ওয়াই-এম-সি এ দলের খেলায় শেষ মুহূর্তে নিজের দলকে জিতিয়ে দেওয়া কাহিনীটিও শুনিয়ে দিল।

ছেলেদের কাছে সব শুনে বীরেনদা শুধু বললেন—তোমাদের এই নতুন অধ্যাপকের খেলা দেখার সৌভাগ্য যদিও আমাদের হয়নি, তবে তোমরা যখন বলছ তখন তোমাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য ওকে নামানোই স্থির করা যাক। তবে তার আগে উনি কোন পজিশনে খেলে অভ্যস্ত, সূর্যদার জায়গায় লেফ্ট-আউটে খেলবেন কিনা, সেটা ভালো করে জেনে টীম গঠন করা দরকার।

ছেলের দল উৎসাহের সঙ্গে বললে—ওঁকে যে কোনো পজিশনে দিন বুলেটের মতো বল ছোটাবেন।

বীরেনদা হেসে বললেন—বুলেটের মতো বল ছোটালেই তো হবে না, বলটা গোলে দেবার উদ্দেশ্যে ছোটাতে হবে। যাই হোক, তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ওকেই নামানো হবে।

গলা ফাটিয়ে ছেলের দল সমস্বরে শ্লোগান দিলে—'ওয়া বীরেনদা কি ফতে'। একঝাঁক হাঁসের মতো কলরব তুলে ছেলের দল ছুটে চলে গেল নবাগত অধ্যাপকের কাছে। সঙ্গে ক্রীড়া-সম্পাদক।

প্রস্তাবটা শুনেই অধ্যাপকের মুখ আমসি। এরা বলে কী! প্র্যাকটিস নেই, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং নেই, মাঠে নামলেই হল?

তার উপর টুরনামেন্টের ফাইনাল খেলা! সেটা তো ছেলেখেলা নয়।

অধ্যাপক বেঁকে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎসাহী হর্ষোৎফুল্ল ছেলের দল মুহূর্তের মধ্যে বোবা হয়ে গেল। কোনো কথা নেই তাদের মুখে। হতাশায়, ক্ষোভে, দুঃখে এবং অভিমানে তাদের দুই চোখে জল ভরে এলো।

ক্রীড়া-সম্পাদক ছোট ছেলেদের মনের অবস্থা অনুমান করলেন। এই একটু আগে বীরেনদার কাছে যাঁর হয়ে এরা কত আবেদন নিবেদন জানিয়েছে এখন তিনিই কিনা একবাক্যে তাদের সব উৎসাহকে নিবিয়ে দিলেন! শুধু তাই নয়, আজকের খেলায় শান্তি-নিকেতন টীম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারবে, সে দৃশ্য এরা সহ্য করতে পারবে না বলেই এত আগ্রহ নিয়ে ছুটে এসেছে অধ্যাপকের কাছে।

ক্রীড়া-সম্পাদক গম্ভীর হয়ে বললেন—দেখুন, আপনি যদি এখন খেলতে রাজী না হন, তাহলে বিষয়টা আমাকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে তুলতেই হবে এবং আপনি আপনার এ্যাপলিকেশনে যেসব গুণা-বলীর ফিরিস্তি দিয়েছিলেন সে-সম্পর্কেও কর্মসমিতির অধিবেশনে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হব। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আজ বিপদগ্রস্ত হয়ে এই ছোট ছেলেরা কতখানি আশা উৎসাহ নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছিল। অন্তত এদের মুখ চেয়ে শত অসুবিধা থাকলেও আপনার আজ খেলায় নামা উচিত।

এবারে অধ্যাপকের কাঁদবার পালা। হায় চাকরি! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজিতে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাশ করে বেকার জীবনের অভিসম্পাত থেকে বাঁচবার জন্যই সামান্য বেতনের অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে এসেছিলেন এই মরুভূমির দেশ শান্তিনিকেতনে।

কিছুক্ষণ নীরব চিন্তার পর সম্মতি দিলেন অধ্যাপক। সঙ্গে সঙ্গে শিশু-বিভাগের ছেলের দল সোল্লাসে বলে উঠল—'ওয়া বেণুদা কি

ফতে।' একদল ছেলে তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল আশ্রমের সবাইকে এই সুসংবাদ দেবার জন্য, আরেকদল থেকে গেল অধ্যাপকের কাছে তাঁর কখন কী প্রয়োজন সব হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হবে।

বেলা তখন চারটে। ফুটবল মাঠে ইতিমধ্যেই বিপুল দর্শক-সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে। তখনকার দিনে ফুটবল মাঠের পুব ও দক্ষিণ দিকটা ছিল বোলপুরের দর্শকদের জন্যে নির্দিষ্ট এবং পশ্চিম ও উত্তর দিকটা থাকত আশ্রমবাসীদের জন্য।

বোলপুরের দর্শকরা বরাবরই তখন বাইরের টীমকেই উৎসাহ দিত, তার একটা কারণও ছিল। বোলপুরের টীম প্রতি বছরই শান্তিনিকেতনের কাছে হেরে যেত বলে বাইরের টীমের কাছে শান্তি-নিকেতন হারুক, এটা তারা চিরদিনই মনে-প্রাণে চাইত। সিউড়ির দলকে সমর্থন জানাবার জন্য বোলপুর থেকে কাতারে কাতারে লোক সাইকেল, গরুর গাড়ি এবং পায়ে হেঁটে ফুটবল মাঠে উপস্থিত। চানাচুরওয়ালাদের ঠুন্ ঠুন্ ঘণ্টাধ্বনিতে খেলার মাঠ সরগরম। ঝুড়ির মধ্যে কাগজের ঠোঙায় বাদামভাজা আর চানাচুর ভরে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ওরা ছুটোছুটি করে বাদাম বিক্রী করে। এই ঘণ্টাধ্বনি শুনেই আশ্রমের ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে, এবার খেলার মাঠে জমায়েত হবার সময় হল।

চানাচুরওয়ালার ঘণ্টাধ্বনি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল মাঠের পশ্চিম দিকে জায়গা নিয়ে আমরা জটলা করছি, এমন সময় দেখা গেল চা-জলযোগ শেষ করে দুই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা রান্নাঘর থেকে মাঠের দিকে আসছেন। শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে সবার পিছনে আসছেন আমাদের ইংরিজির তরুণ অধ্যাপক। দুই পায়ে নী-কাপ অ্যাঙ্কলেট, কালো আর হলদে ডোরাকাটা গেঞ্জীর জার্সিটার আস্তিন দুটো হাতের বাইসেপ পর্যন্ত গোটানো। সঙ্গে আসছে শিশু-বিভাগের সেই ছেলের দল। বুক ফুলিয়ে তারা আসছে,

গর্বোদ্ধত মুখ, যেন আজকের খেলাটা তারাই আজ খেলে জিতে নেবে।

স্থির হল, অধ্যাপক আউট-লাইনেই খেলবেন, তবে সুবিধামতন রাইট-আউটের সরোজদার সঙ্গে জায়গা বদল করে নেবেন।

সাড়ে চারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রেফারী দুই দলের ক্যাপ্টেনকে ডেকে টস করলেন, শান্তিনিকেতন দল নিল মাঠের দক্ষিণ দিক। খেলোয়াড়রা পজিসন নিতেই দেখা গেল আমাদের অধ্যাপক বেণুদা সরোজদার সঙ্গে কী সব ফুস্থুর-ফুস্থুর করে রাইট-আউটে চলে গেলেন, সরোজদা এলেন লেফট-আউটে।

বিপুল উত্তেজনার মধ্যে খেলা শুরু হল। শান্তিনিকেতন দলকে উৎসাহ দেবার জন্য চীৎকার করে আমরা গলা ফাটাচ্ছি, শান্তিনিকেতনের গোলের মুখে বল এলে পুব দিকের বোলপুরের দর্শকদল চীৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছে। হঠাৎ আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের ইংরিজির অধ্যাপক এবং ওয়াই-এম-সি-এ-র দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেনকে বলের ধারে কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত একটাও বল তিনি পা দিয়ে স্পর্শ করেননি। একবার আমাদের দলের সেণ্টার-হাফ সিউড়ির সেণ্টার-ফরোয়ার্ডের পা থেকে বলটা ছিনিয়ে নিয়ে বিপক্ষ দলের দুটো প্লেয়ারকে কাটিয়ে বলটা থ্রু পাশ দিলেন রাইট-আউটকে। হঠাৎ দেখা গেল, বল যেদিকে যাচ্ছে ঠিক তার উল্টো দিকে আমাদের রাইট-আউট তীরবেগে ছুটে চলেছেন। বলটা বশংবদ হয়ে সিউড়ির লেফট-ব্যাকের পায়ে পড়ল। আরেকবার আমাদের ব্যাক বীরেনদা উঁচু করে একটা মাপা সট দিলেন যাতে বলটা রাইট-আউটের ঠিক মাথার উপরে পড়ে। বলটা ড্রপ ধরে যদি টুক করে রাইট-ইনকে ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে অব্যর্থ গোল। কিন্তু বলটা পাছে তাঁর দেহ স্পর্শ করে, তাই তাকে এড়াবার কী প্রাণপণ চেষ্টা! বলটা যেন পারিয়া আর তিনি নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ। ছুঁলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

এমন সময় রেফারী হাফ-টাইমের হুইসিল দিলেন। খেলা তখনো গোলহীন ড্র চলছে। কোল্ড-ড্রিঙ্ক-এর বদলে সে সময়ে খেলোয়াড়দের লেবু খাওয়ানো ছিল রীতি। দু-দুটো লেবু মুখে পুরে অধ্যাপক মহাশয় হাঁপরের মতো হাঁফাতে লাগলেন। ছুটোছুটি করে বেজায় পরিশ্রান্ত। কিন্তু শিশু-বিভাগের ছেলের দল তবু তাঁর কাছে ভীড় করে ছুটে গেল। তারা বুঝতেই পারছিল না, যিনি এতবড় খেলোয়াড় তিনি একটাও বল ধরছিলেন না কেন ?

প্রশ্ন করতেই তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—বুঝেছো, আমাদের তো আবার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এর খেলা খেলে অভ্যাস। কে কোন পজিশনে কি রকম খেলে, কার খেলার কি রকম পদ্ধতি, সেটা জানা না থাকলে এই বিভ্রাট ঘটে। আমি যেখানে পজিশন নিচ্ছি, বল যাচ্ছে তার উল্টো দিকে। ফুটবলটা তো আনতাবড়ি খেলা নয়, আদান-প্রদানের খেলা ; তার জন্য বুদ্ধি আর কৌশল কাজে লাগাতে হয় !

ছেলের দল বিস্মিত হয়ে শুনতে লাগলো সেই একই কথা, যা তিনি খেলার মাঠে কোচিং দিতে এসে দিনের পর দিন বলেছেন।

ইতিমধ্যে হাফ-টাইম শেষ হয়েছে। অধ্যাপক ছেলেদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—'এবার দেখে নিও। স্বপক্ষ আর বিপক্ষ দু'দলের কে কেমন খেলে তা এতক্ষণে সরেজমিনে তদন্ত হয়ে গিয়েছে।'

ছেলের দল উৎসাহভরে আবার মাঠের পশ্চিম প্রান্তে চলে এসেছে এবং খেলোয়াড়রা যে-যার পজিশন নিয়েছে। কিন্তু সবাই বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল এবারও অধ্যাপক সরোজদার সঙ্গে হাত পা নেড়ে কী-সব বলে রাইট-আউট থেকে লেফট-আউটে জায়গা বদল করলেন অর্থাৎ যে পূর্ব প্রান্তে ছিলেন সেই পূর্ব প্রান্তেই থেকে গেলেন।

বোলপুর দর্শকরা মজা পেয়ে গিয়েছে। চিৎকার করে

অধ্যাপককে উৎসাহ দিয়ে বলছে—'বেশ খেইলছেন দাদা, বলিহারী যাই। এই রকম খেইল্যে যান, তাতেই কাজ হবে।'

আবার খেলা শুরু হয়েছে। এবারে সিউড়ি টাউন ক্লাব জোর চেপে ধরেছে শান্তিনিকেতন টীমকে। আমাদের দুই ব্যাক বীরেনদা আর গৌরদা বাঘের মতো আক্রমণ প্রতিরক্ষা করে চলেছেন। ওদিকে সেণ্টার-হাফ বিশ্বনাথদার ঘাসবর্জিত শুকনো মাঠে স্লিপ-খেয়ে দুই পায়ের চামড়া ছড়ে গেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সারা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন ভূতে পাওয়ার মতো। আমাদের দলের খেলোয়াড়রা ততক্ষণে লেফট-আউট অধ্যাপকের খেলার দৌড় বুঝে ফেলেছেন, ওদিকে পারতপক্ষে আর বল দিচ্ছেন না।

অধ্যাপকও নিশ্চিন্ত মনে কোমরে হাত দিয়ে দর্শকের মতোই খেলা দেখে চলেছেন। শিশু-বিভাগের ছেলের দলের মুখে আর রা নেই। হাফ-টাইমের পর খেলা শুরু হবার আগেই তারা বলাবলি করছিল— এইবার দেখিস বেণুদার খেলা। কাকে বলে ড্রিবিল ডিজ আর পাস্, ভালো করে দেখে নিস। আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে কি না।

শেষ পর্যন্ত খেলা ড্র হল। কোনো পক্ষে কোনো গোল নেই। স্থির হল, পরের সপ্তাহে সিউড়ির মাঠে রিপ্লে হবে। বোলপুরের দর্শকদল সিউড়ির খেলোয়াড়দের 'সাবাস' আর 'বাহবা' দিতে দিতে বোলপুর স্টেশনে চলে গেল। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার গাড়িতে খেলোয়াড়রা সিউড়ি চলে যাবে।

শান্তিনিকেতনের ছেলের দল খুবই মনমরা। খেলা ড্র হয়েছে বলে দুঃখ নয়। সিউড়িতে খেলা হলে তাদের সে খেলা দেখার সুযোগ হবে না এইটিই তাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ। তাছাড়া ফুটবল কোচ অধ্যাপক তাদের আশা ও উৎসাহ এমনভাবে ধ্বসিয়ে দেবেন সেটাও তারা কল্পনা করতে পারেনি। সেই দুঃখকে তারা সহ্য করতে পারেনি বলেই বোধহয় ম্লানমুখে যে-যার ডরমিটরিতে ফিরে গিয়েছিল।

ছোট ছেলেরা বুঝতে পেরেছিল কিনা জানি না, কিন্তু অধ্যাপকের সেদিনের খেলার নমুনা দেখে আমরা অন্তত এটুকু বুঝে ফেলেছিলাম যে, তিনি কস্মিনকালে ফুটবল মাঠে নামেননি, পা দিয়ে কোনো দিন বল ছুঁয়েছেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

পরদিন সকালে প্রথম পিরিয়ডেই ছিল সেই অধ্যাপকের কাছেই আমাদের ইংরিজির ক্লাস। লাইব্রেরীর কাছে যে বকুল গাছটার তলায় নিয়মিত তিনি ক্লাস নেন সেখানে বসে আমরা জটলা করছি। মাস্টার মশাইয়ের দেখা নেই। আমাদের মধ্যে কে একজন বিদ্রূপ করে বললে—'কাল খেলার মাঠে বড় বেশী পরিশ্রম করেছেন, বোধ হয় গায়ে হাত পায় খুবই ব্যথা। বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না।'

এমন সময় কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বেয়ারা এসে আমাদের খবর দিল যে আমাদের ক্লাস হবে না। ইংরিজির অধ্যাপক গতকাল রাত্রেই কলকাতা চলে গেছেন এবং যাবার আগে প্রিন্সিপ্যালের কাছে চিঠি লিখে গেছেন যে, তিনি আর চাকরি করবেন না।

এ-রকম একটা সংবাদ শুনবার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। অধ্যাপকের জন্য সহানুভূতি ও সমবেদনায় আমাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আমরা তৎক্ষণাৎ প্রিন্সিপ্যালের কাছে আবেদন জানালাম তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। প্রিন্সিপ্যাল সে-অনুরোধ তাঁকে জানিয়েও ছিলেন। কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি।

ইতিমধ্যে কয়েক বছর পার হয়ে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনের পাঠ শেষ করে আমি তখন কলকাতায়। কিন্তু সেই অধ্যাপক সম্পর্কে আমার একটা দুর্বলতা ছিল, আকর্ষণও ছিল, আর ছিল কিছু কৌতূহল, পরবর্তী জীবনে তিনি কোথায় কী করছেন সেইটুকু জানার।

অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁর সম্পর্কে শেষ সংবাদ যা জানতে পেরেছিলাম, তা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

৭

সেই ইংরিজি অধ্যাপকের কথাই বলি যিনি শান্তিনিকেতনে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন ঝানু ফুটবল খেলোয়াড়ের অতিরিক্ত গুণের পরিচয় দিয়ে। পরে ধরা পড়ে গেল, জীবনে তিনি কোনোদিন ফুটবলে পা ছোঁয়াননি। এবং ধরা পড়ামাত্র রাতারাতি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছিলেন।

আমি কিন্তু এই অধ্যাপকের প্রতি গভীর সহানুভূতি নিয়েই তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম।

আমরা এমন একটা যুগে জন্মেছি যখন যেন-তেন-প্রকারেণ সিদ্ধিলাভ করাটাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র কাম্য। 'সদা সত্য কথা কহিবে'-র যুগ কবে কেটে গিয়েছে, চারুপাঠের এই আপ্তবাক্য আজ বিরাট প্রহসনে পরিণত। সমাজে আজ যারা এই আপ্তবাক্যকে আঁকড়ে ধরে জীবনে সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছে, সমাজ তাদেরই ঘৃণা, উপেক্ষা, অনাদর আর অবমাননার চরম শাস্তি দিয়েছে। সত্যনিষ্ঠ মানুষরা এ-যুগের সমাজে 'গোবেচারা ভাল মানুষ' আখ্যা পেয়ে করুণার পাত্র হয়েই থেকেছেন।

আজ আমার মনে পড়ছে, এই কারণেই বোধহয় প্রমথনাথ বিশী এই সমাজকে বিদ্রূপ করে এক কিশোর ছাত্রের অটোগ্রাফ খাতায় লিখেছিলেন—'জীবনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে সদা সত্য কথা কহিবে না।'

চাকরির দরখাস্তে কিঞ্চিৎ অনৃতভাষণের অপরাধে আমি কিন্তু অধ্যাপককে অপরাধী করতে চাইনে। খেলার মাঠ, ফুটবল আর

পদযুগলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর না থাকলেও মোহনবাগান বা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের অগণিত সমর্থকদের মতো খেলাধূলা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কিছু কম ছিল না। লোকমুখে শুনেই হোক, নিত্য-নিয়মিত খেলা দেখেই হোক অথবা পুঁথি পড়েই হোক, ফুটবল খেলার থিওরিটিক্যাল জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন। শিশুবিভাগের ছেলেদের ইন্সট্রাকটর স্বরূপ সে জ্ঞান তিনি ভালোভাবেই কাজে লাগাচ্ছিলেন। মাঝখান থেকে বাদ সাধলেন সূর্য চক্রবর্তী।

যাই হোক, পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে বহু অনুসন্ধানের পর এই অধ্যাপকের খোঁজ আমি পেয়েছিলাম। ওয়াই-এম-সি-এ হোস্টেলে বার কয়েক ঘোরাঘুরির পর তাঁর এক সতীর্থের সন্ধান পেলাম। ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁর বাড়িতে গিয়ে অধ্যাপক সম্পর্কে প্রশ্ন করে যা জানা গেল তাতে আমার চক্ষুস্থির।

শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার পর অধ্যাপকের চাকরির জন্য কলকাতা ও বাংলাদেশের বহু কলেজে দরখাস্ত করেও কোথাও তিনি চাকরি জোগাড় করতে পারলেন না। অবশেষে দেরাদুনে এক পাবলিক স্কুলে সাঁতার-শিক্ষকের চাকরি পেয়ে চলে গেলেন। সে-চাকরিতে সুনামও হয়েছিল খুব। সাঁতারের বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন স্ট্রোক অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন, ছেলেরাও তাঁর সন্তরণ পাণ্ডিত্যের পরিধিতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে বেশ কয়েক বছর তিনি দিব্যি চালিয়ে গেলেন।

হঠাৎ একদিন ছাত্রদের কাছে আবিষ্কৃত হল যে, তাদের সাঁতার-শিক্ষক আর সবই জানেন, শুধু নিজে সাঁতার জানেন না। জানবেনই বা কী করে। কলকাতার ছেলে, চিরকাল কলকাতাতেই মানুষ। জলের কল আর চৌবাচ্চা পর্যন্ত দৌড়, নদী পুষ্করিণীর ধারে যাবার প্রয়োজন কোনোদিন তাঁর হয়নি।

একদিন ডাইভিং বোর্ডের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছাত্রদের বুঝিয়ে

দিচ্ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ান ব্রেষ্ট স্ট্রোক কী ভাবে দিতে হয়। টাল সামলাতে পারেননি, একেবারে পপাত পুষ্করিণীতলে। ডুবেই যাচ্ছিলেন, ছেলেরা তাঁর অবস্থা অনুমান করে পাড়ে টেনে তুলল। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই, ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করার যে প্রণালী ছাত্রদের তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষালব্ধ প্রণালী প্রয়োগ করেই ছাত্ররা তাঁকে উদ্ধার করেছিল।

খবরটা স্কুল কর্তৃপক্ষর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বরখাস্ত করা হল।

এক মাসের নোটিশ, স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে। ছাত্রদের দল কৃতজ্ঞতাপরবশ হয়ে এই এক মাসে তাঁকে সাঁতার দেওয়া শিখিয়ে দিল এবং ছাত্রদেরই একান্ত অনুরোধে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্কুলে তাঁকে পুনর্নিয়োগ না করলেও পুনার এক স্কুলে সাঁতার-শিক্ষকের চাকরি তাঁকে জুটিয়ে দিলেন।

সেখানে আবার কিছুদিন বাদেই খবর পাওয়া গেল যে, সাঁতার-শিক্ষকের কাজে তিনি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নিজে তিনি সাঁতার কাটায় চৌকশ হয়ে উঠলেন, কিন্তু ছাত্রদের অভিযোগ—সাঁতার কাটা শেখাতে তিনি কিছুই পারেন না। সুতরাং সে চাকরিও তাঁর আর টিকল না।

হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের চেষ্টায় এবার তাঁর আরেকটি নতুন চাকরি জুটে গেল। ভোপালের নবাবের স্কুলে ছেলেদের ঘোড়ায় চড়া শেখাবার কাজ।

ব্রীচেস্ আর স্পোর্টস কোট, হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো, হাতে ঘোড়দৌড়ের মাঠের জকীদের মতো বেতের বেঁটে চাবুক, মাথায় বারান্দা-ওয়ালা বেরে ক্যাপ। প্রতিদিন ভোরে এক ঘণ্টা তাঁর কাজ ছিল ঘোড়ায় চড়ার নানাবিধ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক বক্তৃতা দেওয়া এবং চোস্ত ইংরিজিতে অনর্গল তিনি জলবৎ তরল করে তা বুঝিয়ে দিতেন। কাকে বলে গ্যালপ্, কাকে বলে ট্রটিং এবং গ্যালপের

সময় জিন-এর দুই পাশে হাঁটুর চাপ এমন ভাবে রাখতে হবে যে, দুই পায়েরই জিন আর হাঁটুর মাঝখানে দুটি পয়সা রেখে দিলে যতই তুমি ঘোড়দৌড় করো পয়সা দুটি পড়বে না।

লেকচার শুনে ছাত্ররা মহাখুশী। ঘোড়া ও ঘোড়দৌড় সম্পর্কে থিওরিটিক্যাল জ্ঞান তাদের পাকাপোক্ত হতে লাগলো, এবার প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনের পালা।

এবার কিন্তু অধ্যাপক চালাক হয়ে গিয়েছেন। স্থির করলেন, ছেলেদের কাছে ধরা পড়বার আগে আস্তাবল থেকে ঘোড়া বার করে চুপি চুপি ঘোড়ায় চড়া শিখে নেবেন।

এক রবিবার, ছুটির দিন। ভোরবেলা সবচেয়ে নিরীহ একটা ঘোড়া বেছে নিয়ে লাগামটা ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন স্কুল থেকে মাইল দেড়েক দূরের এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায়।

ঘোড়ার গলায় ঘাড়ে পিঠে তোয়াজ করে হাত বুলিয়ে তাকে ধাতস্থ করে নিলেন। তারপর রেকাবিতে বাঁ পা-টা ঢুকিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যেই না ঘোড়ার পিঠে চেপে বসা, আর যাবে কোথায়—পাঁই পাঁই করে ঘোড়া ছুটল সোজা আস্তাবলের দিকে। রুখবার জন্যে লাগাম যত জোরে টানেন তত জোরেই ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। অধ্যাপকের অবস্থা কাহিল। একবার বাঁ দিকে হেলে পড়েন, অতি কষ্টে টাল সামলে উঠতে না উঠতেই আবার ডান দিকে হেলে পড়ছেন। যখন বুঝলেন ঘোড়া আর বাগ মানবেই না, তখন লাগাম ছেড়ে দুই হাত দিয়ে সজোরে আঁকড়ে ধরে রইলেন জিনটাকেই।

রবিবার সকাল, ছেলেরা স্কুল-কমপাউণ্ডে ক্রিকেট খেলছিল। হঠাৎ ঐ ভাবে অধ্যাপক সমেত ঘোড়া ছুটে আসতে দেখে ছেলের দল প্রমাদ গণল। ঘোড়া যদি স্পীড নিয়ে সোজা আস্তাবলে ঢোকে তাহলে আস্তাবলের শেড-এ অধ্যাপকের মাথা নির্ঘাৎ কাটা পড়বে।

ক্রিকেট বল ব্যাট ফেলে ছেলের দল হৈ-হৈ করে ছুটে এল, সবাই মিলে ঘোড়ার গতি আস্তাবলের দিক থেকে তো ফেরাল, কিন্তু ঘোড়া থামবার পাত্র নয়। সারা মাঠময় ছুটোছুটি করে একটা হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলল। অবশেষে অধ্যাপকের কাছেই ঘোড়-দৌড়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি ছাত্র আস্তাবল থেকে আরেকটি ঘোড়া বার করে তাতে চড়ে অধ্যাপকের ঘোড়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করে অবশেষে ঘোড়ার লাগামটা হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরে ঘোড়াকে নিরস্ত করল। তা না করলে অধ্যাপকের মৃত্যু ছিল অনিবার্য।

অধ্যাপককে ধরাধরি করে ঘোড়ার পিঠ থেকে যখন ছেলেরা নামাল, তখন তাঁর প্রায় অচৈতন্য অবস্থা। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ঠক ঠক করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। অধ্যাপকের এমন অবস্থা দেখে ছেলেরা হাসি সংবরণ করতে পারেনি। কারণ ঘোড়দৌড় শিক্ষার ইনস্ট্রাকশন দেবার সময় প্রায়ই তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে বলতেন—'ঘোড়ায় চড়া শিখতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন নিজের প্রতি বিশ্বাস আস্থা আর সাহস।'

কিন্তু শিক্ষকের নিজের ক্ষেত্রে এই উপদেশের চরম ব্যর্থতা দেখে ছাত্রদের মুখে যদি হাসি দেখা দেয়, তা'হলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

এই রকম একাধিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই অধ্যাপক জীবনে সাফল্য লাভ করেছিলেন, তার দীর্ঘ ফিরিস্তি এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তাঁর সম্পর্কে শেষ সংবাদ যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম সেটুকু জানিয়েই অধ্যাপক-প্রসঙ্গ শেষ করব। উপস্থিত এই অধ্যাপক একটি এভিয়েশন স্কুলে ইনস্ট্রাকটারের পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। মোটা মাইনের চাকরি এবং ছাত্রদের শেখাচ্ছেন, কী করে উড়োজাহাজ চালাতে হয়। ছাত্ররা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তারা বলে, এমন সুদক্ষ এভিয়েটর ইতিপূর্বে তারা নাকি আর দেখেনি।

কথাটা হচ্ছিল জীবনে সাফল্য অর্জন করা নিয়ে। মানুষ মাত্রেই ভাবে এক, হয় আর। অন্তত পূর্বকথিত অধ্যাপকের কাহিনী এ-কথার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শৈশবে পাঠ্য পুস্তকের একটি কবিতার দুটি লাইন আমাদের মুখস্থ করানো হতো, যাতে পরবর্তী জীবনে সাফল্য অর্জনে তা আমাদের উৎসাহিত করে। কবিতার লাইন দুটি হচ্ছে 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ, উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।'

এই দুইটি পংক্তি আমার জীবনে এবং আরো কয়েকজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জীবনেও যে কোনো প্রেরণাই জোগায়নি, আমি তা জানি।

আমার কথাই ধরুন না। শৈশব ও কৈশোর জীবনে আমার মনোরথ ছিল নাম-করা গাইয়ে হওয়া। উদ্যমের অভাব আমার ছিল না, তালিমও পেয়েছিলাম সেরা গুরুর কাছে এবং গানের গলাও নাকি এক সময়ে আমার ভালোই ছিল। বহু নাম-করা ওস্তাদের আসরে রাতের পর রাত জেগে গান শুনেছি, গান বাজনার মহফিল বা মজলিশের গন্ধ পেলে সবার আগে ফরাসের এক কোনায় আমি জায়গা নিয়ে বসে আছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল কী! গানের রস কবে কোন মরুভূমিতে এসে শুকিয়ে গেল; এক বৃহৎ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের একটি ছোট কাগজে নগণ্য সাংবাদিক হয়ে কলম পিষছি। আজ পঁচিশ বৎসর আমার কণ্ঠ থেকে গান বিদায় নিয়েছে। সেকালের বন্ধুরা যখন অনুতাপের সঙ্গে আমার গলায় শোনা গানের তারিফ করেন, একালের পরিচিতরা তা শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসেন।

আমার আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা বলি। তার মনোরথ ছিল নাম-করা ডাক্তার হবে। বহু কষ্ট করে মেডিকেল কলেজে সে ভর্তি হয়েছিল, পাসও করেছিল সাফল্যের সঙ্গে।

কিন্তু এখন? এখন সে মরা মানুষের হাড় বিদেশে চালান দেওয়ার ব্যবসা করে বাড়ি গাড়ি আর প্রচুর টাকার মালিক।

এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনে। জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে উদ্যম চাই, এ-কথা ছেলেবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে এ-কথাটার কোনো গুরুত্বই দিই না। কারণ, কথাটা আমার কাছে নিতান্তই ছেঁদো কথা। বরঞ্চ এর উল্টোটাই অধিকাংশ মানুষের জীবনে সাফল্য এনে দিয়েছে। সুতরাং 'উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ' কথাটা সামান্য বদল করে যদি বলি 'উদ্যম বিহনেই পুরে মনোরথ', তাহলে কিছুমাত্র মিথ্যা বলা হবে না। কারণ আজকের দিনে সাফল্য অর্জনের বোধ হয় এইটিই একমাত্র পন্থা এবং তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত নিত্য-নিয়তই আমাদের চোখের সামনে ঘটছে।

এ প্রসঙ্গে আবার আমি আমার নিজের কথাতেই ফিরে আসি। ১৯৩৭ সালে আজকের দিনের এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় ত্রিশ টাকা মাইনের সাব-এডিটর হয়ে যখন প্রথম ঢুকেছিলাম তখন কি আমি কল্পনা করতে পেরেছিলাম যে, যার মধ্যে সাংবাদিকতার 'স'-ও নেই, এক লাইন লিখতে গেলে যার কলমের নিব ভেঙ্গে যায় তাকে সাংবাদিকতার গুণেই বিদেশী সরকারের সম্মাণিত অতিথি হয়ে পরিণত বয়সে সারা ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণে যেতে হবে! এবার সেই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার দুটি কাহিনী আপনাদের শোনাব।

৮

আমি আসলে আরামবিলাসী লোক, ভ্রমণবিলাসী নই। কলকাতা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে আমার তিনতলা ফ্ল্যাটের ছোট্ট ঘরখানিতে খাটের উপর তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খবরের কাগজে মুখ গুঁজে দুনিয়া দেখা আমার ত্রিশ বছরের অভ্যাস। এ-হেন লোককে কিনা অবশেষে যেতে হল বিদেশ ভ্রমণে। ১৯৬১ সাল, সে-ই আমার প্রথম সাগরপাড়ি। পশ্চিম জার্মানীতে তিন সপ্তাহ ধরে আমার এই স্থূল দেহকে লাট্টুর মতো ঠাসবুনোট ভ্রমণ-সূচীর লেত্তিতে বেঁধে বন্ বন্ করে বার্লিন থেকে কলোন, কলোন থেকে বন্, বন্ থেকে ডসেলডর্ফ ইত্যাদি ঘোরাতে ঘোরাতে অবশেষে যখন ম্যুনিখ থেকে লণ্ডনে এনে ফেললে তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কন্ডাক্টেড্ ট্যুর ব্যাপারটাই ততদিনে আমার কাছে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। নিজের মন-মেজাজ অবসর ও অবকাশ নিয়ে চলাফেরার সুযোগ তোমার নেই, তুমি যেন জুড়ি-গাড়ির একটি ঘোড়া। সকাল আটটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত ছুটে চলাই তোমার কাজ। থেকে থেকে ভ্রমণ-সূচীর সময়নির্দেশক চাবুকটি শপাং শপাং করে পিঠের কাছে আওয়াজ তুলে জানান দিচ্ছে—নাই নাই নাই যে সময়।

লণ্ডন এয়ার পোর্ট থেকে বাস্টা যখন শহরের টার্মিনাসে এসে পৌঁছল, লণ্ডন-প্রবাসী কয়েকজন বাঙালী বন্ধু অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—'জাঁতাকলে ফেলে খুব ঘুরিয়ে মেরেছে তো? এবার লণ্ডন এসেছেন, কয়েকদিন ছুটি উপভোগ করুন।'

লণ্ডন শহরে আমি নতুন মানুষ এসেছি। কিন্তু শহরে পা দিয়েই মনে হল এ-যেন আমার কতকালের চেনা। কলকাতার সঙ্গে লণ্ডনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত কিছু সান্নিধ্য আছে বলেই কি এ-শহর আমার কাছে অপরিচিত বলে মনে হল না? ঠিক তা নয়। আশৈশব লণ্ডন শহরের ইতিকথা শুনেছি, ছবি দেখেছি। শহরের একটা কল্পরূপ আমার মনে বহুকাল ধরেই আঁকা। এই শহর সম্পর্কে যে-ধারণা এতকাল মনের মধ্যে লালন করে এসেছি, তাকে প্রত্যক্ষ গোচরের দ্বারা মিলিয়ে দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বহু ক্ষেত্রেই আমার ধারণার সঙ্গে মিলেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেলেনি। যা মেলেনি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ছুটির দিনের লণ্ডন।

হুইট্সন্ ছুটির মুখেই লণ্ডনে এসেছি। শনিবার বেলা একটা পর্যন্ত কাজ হয়েই তিন দিন ছুটি। আমার ধারণা ছিল, লণ্ডন-আকাশের হিমেঢাকা ঘোমটাখানি সব সময় ধূমল রঙে আঁকা। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল। নির্মল নীল আকাশ, সোনাঝরা রোদ্দুরে শহর ঝলমল করছে। শীতের দেশ ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকাল শুরু, তদুপরি তিন দিন ছুটি আর আকাশভরা সূর্যের আলো। এমন দিনে ঘরে থাকা যায়? দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে পথে, শহর থেকে অদূরে টেমস্ নদীর উপকূলবর্তী শ্যামল বনভূমিতে।

সকালে এসে লণ্ডনে পৌঁছেছি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শহরের রাস্তায়। এ-শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নবাগন্তুক এখানে নিজেকে কখনই অনাবশ্যক বোধ করে না। কে বা আপন কে বা অপর, তাই নিয়ে মাথা-ঘামানো লণ্ডন শহরের কাজ নয়। সবার পরশে পবিত্র করা এই মহানগরী মহামিলনের তীর্থক্ষেত্ররূপে আজ উষ্ণ হৃদয়ের আহ্বান জানিয়ে বলছে—'হে বিদেশী, এসো এসো।'

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম জনমানবশূন্য পথ দেখে। সকাল বেলায় যে-রাস্তায় লোক গিজ্ গিজ্ করছিল, বিকালে সে-পথ

শ্মশানভূমি। আমরা ঘরমুখো বাঙালী। ছুটির দিনে ঘরেই শুয়ে বসে গড়িয়ে তাস পিটিয়ে দিন কাটাই। আর এরা? ছুটির দিনে বারমুখো শুধু নয়, একেবারে শহর-বিরাগী। শহর থেকে এক বেলার মধ্যে কোথায় যেন সব উধাও হয়ে গেল। নির্জন গ্রাণ্ট স্ট্রীট দিয়ে আমরা কয়েকজন হেঁটে চলেছি, ট্রাফালগার স্কোয়ারের পায়রাগুলি নেলসন কলামের চার পাশে পাক খেয়ে ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে, ছোলা খাওয়াবার লোকের আজ বড়ই অভাব। নীরব নির্জন লণ্ডন নগরীর অবস্থা দেখে আমি যখন হা-হুতাশ করছি, তখন আমার সহযাত্রী বন্ধু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ বললেন—'শবদেহ নিয়ে কান্না কেঁদে কী হবে! তার চেয়ে চলুন কাল সকালে আমরাও বেরিয়ে পড়ি সমুদ্রের ধারে, যেখানে সবাই গেছে।'

পরামর্শ চলল, কোথায় যাওয়া যায়। সাউথ-এণ্ড, হেষ্টিংস্ না ব্রাইটন। বন্ধুবর বললেন—'ব্রাইটনেই চলুন। শুনেছি ওখানকার সমুদ্রতীর এখানকার বড়লোকদের অবকাশ বিনোদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র'।

পরদিন সকালে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য। টিকিট ঘরের জানালা থেকে লম্বা কিউ জিলিপির প্যাঁচের মতো চলে গিয়েছে, কোথায় তার শেষ, খুঁজে পাওয়া শক্ত। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর যাত্রীবোঝাই ট্রেন ছুটে চলেছে ব্রাইটনের পথে। দ্রুতগামী অথচ মধ্যবর্তী কোনো স্টেশনে থামবে না এমন একটি ট্রেনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠে পড়লাম, বসবার জায়গা নেই।

একঘণ্টা পর বেলা এগারোটায় ব্রাইটন স্টেশন টারমিনাসের প্ল্যাটফর্মে কয়েক হাজার লোক ছিটকে পড়ল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, খোকা-খুকু—এক বিরাট জনস্রোত জলস্রোতের মতো ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। এমন কি তিন মাসের ঘুমন্ত শিশুটিকে প্র্যামবুলেটারে দ্রুত পদক্ষেপে ঠেলে নিয়ে চলেছে মা।

বালুকাবেলা নয়, উপল উপকূল। উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা নেই, ধীর স্থির শান্ত সমাহিত সমুদ্র। যত বেলা বাড়ছে, উন্মত্ত হয়ে উঠছে নুড়িবিছানো তীরভূমি। রঙ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। সাজ-পোশাকে রঙ, রঙ লেগেছে মনেও। ওভারকোট আর ম্যাকিনটশ পেতে আলিঙ্গনাবদ্ধ শত শত যুগল মূর্তি এপাশ-ওপাশে ছড়ানো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে তারি মাঝে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছ'পেনীর ভাড়া-করা ডেক্‌চেয়ার পেতে সমুদ্রের দিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি মেলে ভাবছে তাদের যৌবনকালের কথা। তাদের কালে কি এ-ভাবে ছুটি উপভোগ করতে পারত ?

কে যেন বলছিল, গত যুদ্ধের পর এদেশের তরুণ-তরুণীদের মনোভাব বেশ খানিকটা পালটে গেছে। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এরা অনুধাবন করেছে কিনা জানি না, তবে দু'-দুটো যুদ্ধের পর এ-সত্য তারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে যে, জগৎ অনিত্য, সুখ ক্ষণস্থায়ী। আনন্দের যে-মুহূর্তটুকু তুমি মুঠোয় পেয়েছ তাকে পূর্ণ করে উপভোগ করো। যাকে কাছে পেয়েছে তাকে হারাবার ভয় বড় বেশি বলেই যতক্ষণ কাছে পায় তাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখে।

আমরা ভারতীয়, আমাদের অনভ্যস্ত চোখে এ-দৃশ্য কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বলে মনে হয়। এদের জীবনে হয়তো এইটিই আজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কাজের দিনে এরা নানা কাজের মানুষ, ছুটির দিনে এরা তাই দু'টি স্বপ্নমদির আঁখি আর সুখনিবিড় বাহু-বল্লরীর বন্ধনে সহজেই আত্মসমর্পণ করে।

বেলা দ্বিপ্রহরে যে-যার বান্ধবী নিয়ে সমুদ্রতীর সংলগ্ন পাব আর রেস্তোরাঁয় ভিড় জমিয়েছে পানাহারের সন্ধানে। দাঁড়াবার জায়গা নেই, কাউন্টারের উপর গ্লাস নিয়ে পানীয়ের জন্য ঠেলাঠেলি। কী ব্যাপার। এত তাড়াহুড়ো কেন। ওদিকে রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরে সংকীর্ণ স্থানে একটি ইতালীয় তরুণ গান করে চলেছে, তারি ছন্দে

যে-যার বক্ষোলগ্না বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে উন্মত্ত হয়ে নেচে চলেছে ইংরেজ যুবকদল।

সহসা বারটেণ্ডার তারস্বরে চিৎকার করে বললেন—'নো মোর ড্রিঙ্কস্, নো মোর ড্রিঙ্কস্।'

হঠাৎ অবেলায় পানীয় নিষিদ্ধ হল কেন বুঝতে পারলাম না। কাউন্টারের একধারে এক প্রৌঢ় ইংরেজ কোলাহলের মধ্যে নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে আপন মনে বীয়ারের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলেন। সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—'হঠাৎ এখন ড্রিঙ্কস্ বন্ধ হবার কারণটা জানতে পারি?'

'বেলা তুটো বেজেছে।'

'বেলা তুটোয় পানীয় বন্ধ, এ রকম তো আর কোথাও শুনিনি।'

'তা হয়তো শোনোনি, তবে এখানে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে।'

সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল-এর 'একুশে আইন' কবিতাটি মনে পড়ে গেল। এটাও কি তাহলে কোনো আজব দেশের রাজার আইন?

প্রৌঢ় আবার বললেন—'ছুটির দিনে দলে দলে শহুরে ছোকরারা এখানে ছুটি উপভোগ করতে এসে পানোন্মত্ত হয়ে হুজ্জুত করে। স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তিতেই সরকার এই আইন প্রবর্তন করেছেন। ব্রাইটন থেকে লণ্ডনের শেষ ট্রেন ছাড়ে সন্ধ্যা ছ'টায়। যে ভিড় এখন দেখছেন, ছ'টার মধ্যেই তা ফাঁকা হয়ে যাবে। সুতরাং আবার ছ'টার পর যথারীতি পানাগারগুলি খোলা হবে।'

প্রৌঢ়কে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে নেমে পড়লাম। সাহিত্যের মারফত এদেশের রাগী ছোকরার দলের কথা কিছু কিছু জানা ছিল। এ-ব্যবস্থা তারি পরিণতি কি না জানিনে, তবে আমরা তু'জন স্থান-ত্যাগ করে স্টেশনের দিকেই হাঁটা দিলাম। এতক্ষণ এ-তল্লাটে

পুলিসের চিহ্নমাত্র ছিল না, এখন দেখছি গাড়িভর্তি পুলিস এসে হাজির। সমুদ্রতীরের শালীনতা রক্ষার জন্যই বোধহয় ওদের সহসা আবির্ভাব।

বেলা তখন তিনটে। আমাদের ফেরার কথা ছিল বিকেল ছ'টায়। কিন্তু যে দৃশ্য এতক্ষণ ধরে দেখেছি তার নেশা মনকে এমন অবসাদগ্রস্ত করে ফেলেছে যে, একরাশ বিরক্তির বোঝা নিয়ে একটা লণ্ডনগামী ট্রেনের কামরায় উঠে বসলাম। এবার এক্সপ্রেস ট্রেন নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেন, সব স্টেশনে থামতে থামতে যাবে।

ফাঁকা ট্রেনের একটি কামরায় উঠে পড়লাম। চারজন করে মুখোমুখি আটজনের বসবার কামরা, পুরু গদী-আঁটা সীট। এক কোণায় একটি ইংরেজ যুবক একমনে বই পড়ছেন। গায়ের রেন-কোটটা পাশে খুলে রেখে হাত-পা ছড়িয়ে আমরা দু'জন বসলাম। ক্লান্তির অবসানের জন্য এখন একটু ঘুম দরকার।

ট্রেন ছাড়তে তখনো মিনিট দু'তিন বাকি। প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ ইংরেজ কোনো রকমে টলতে টলতে আসছেন আর একেবারে আমাদের কামরার সামনেই এসে হাজির। বৃদ্ধ নেশায় বুঁদ। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে মাথার ফেল্ট হ্যাটটা একটু উঁচু করে তুলে আমাদের তিনজনকে উদ্দেশ করে বললেন—'গুড আফটারনুন। এখানে বসতে পারি?'

বৃদ্ধের কথা জড়িয়ে আসেছে, পা টলছে। কিন্তু ইংরেজ আভিজাত্যের সবকিছু ছাপই তাঁর সর্বাঙ্গে বর্তমান। হাতে ছড়ি, ছড়ির বাঁটের সঙ্গে হাতের দস্তানা দুটো ধরা। স্বস্থানে বসেই বৃদ্ধ প্রথম ওয়েস্ট কোট-এর বোতামের ঘরের সঙ্গে চেন-বাঁধা ঘড়িটা বার করে দেখে বললেন—'গাড়ি ছাড়তে এখনো দু'মিনিট বাকি।'

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, আশেপাশে এত ফাঁকা কামরা থাকতে বৃদ্ধ আমাদের কামরাতেই উঠলেন কেন। নেশাখোর

মানুষের গল্প করার লোকের প্রয়োজন হয়। সারাটা পথ সময় কাটাবার জন্যে বোধহয় গল্প করতে চান, তাই উপলক্ষ খুঁজছেন।

আমাদের তরফ থেকে খুব বেশি সাড়া পেলেন না, ইংরেজ যুবকটিও বই পড়ায় মগ্ন।

বৃদ্ধ আবার জড়িত কণ্ঠে বললেন—'জানেন, সকাল থেকে অত্যধিক মদ্যপান করেছি। আরও করবার ইচ্ছে ছিল।'

তথাপি আমরা নিরুত্তর। ইংরেজ যুবক বইয়ের পাতা উল্টে অপর পাতায় মনোনিবেশ করলেন।

বৃদ্ধের গল্প করবার ঝোঁক চেপেছে, নাছোড়বান্দা। এবার আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন—

'তোমরা কি কিঙস্ ইণ্ডিয়া থেকে এসেছো ?'

আর যায় কোথা ! আমার সহযাত্রী সন্তোষ ঘোষ একটু রগচটা, ওটা বয়সের দোষ। তার উপর ব্রাইটনবীচের ও-সব কাণ্ডকারখানা দেখে মন-মেজাজ গোড়া থেকেই খিঁচিয়ে ছিল। ফোঁস করে উঠলেন। বললেন—'কিঙস্ ইণ্ডিয়া বলতে তুমি কোন্ দেশকে বোঝাচ্ছ ?'

বৃদ্ধ তেমনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন—'রেড ইণ্ডিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তফাৎ করার জন্যে তোমাদের দেশটাকে আমরা কিঙস্ ইণ্ডিয়া বরাবরই বলে থাকি।'

আমার সঙ্গীর অপমানবোধ খুবই টনটনে। বিশেষ করে বিদেশে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেউ যদি অবমাননাকর কোনো মন্তব্য করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ জান লড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। বৃদ্ধের কথার জবাবে সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন—

'তুমি দেখছি তোমাদের দেশের রিপ্ ভ্যানউইঙ্কিল-এর এক নতুন সংস্করণ। চোদ্দ বছর ধরে বুঝি ব্রাইটনের ভাঁটিখানায় পড়ে ছিলে, আজ প্রথম উঠে এসেছো। আমাদের দেশ যে আর কিঙস্ ইণ্ডিয়া নয়, এমন কি তোমাদের কুইনস্ ইণ্ডিয়াও নয়, সে খবর বুঝি এতদিন জানবার সুযোগ পাওনি ?'

বৃদ্ধের মুখ লাল হয়ে উঠল, গুম হয়ে বসে রইলেন। পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই ছড়ি টুপি দস্তানা গুছিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ উঠে পড়লেন, নেমে গেলেন প্ল্যাটফর্মে। বোধহয় এইটিই ওঁর গন্তব্যস্থল। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, বৃদ্ধ টলায়মান অবস্থায় পাশের কামরায় উঠে পড়লেন। কোণায় বসা ইংরেজ যুবকটির দিকে তাকিয়ে দেখি, বইয়ের পাতায় তখনো তার দৃষ্টি আবদ্ধ, মুখে কৌতুকের হাসি।

৯

ঘর হতে যার আঙিনা বাহির, তাকে কিনা ছ'মাসের জন্য সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যেতে হল সুদূর আমেরিকায়। আমি স্বভাবত ঘর-কুনো। কলকাতা শহরে বাড়ি আর আপিস, আপিস আর বাড়ি—এই চৌহদ্দির মধ্যেই আমার আনাগোনা। বছরে দুবার কলকাতা ছেড়ে একশ' মাইল দূরে পৈতৃক ভিটে শান্তিনিকেতন পর্যন্তই আমার দৌড়। দু-একবার যে দিল্লী বোম্বাই করিনি তা নয়, তবে হয় তা সপরিবারে, অথবা সবান্ধবে। সঙ্গীরিক্ত দেশভ্রমণে আমি অভ্যস্ত নই। একা ভ্রমণ করার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একবারই ঘটেছে এবং ঘটেছে পরিণত বয়সেই।

জব্বলপুর থেকে কলকাতায় ফিরছি। একেবারে একা। ঐ যে গোড়াতেই বলেছি, আমি ঘর-কুনো, আসলে আমার চরিত্রের একটা প্রধান দোষ, আমি লোকের সঙ্গে মিশতে পারিনে। অনেক লোককে দেখেছি ট্রেনে সহযাত্রীদের সঙ্গে কত সহজে আলাপ জমিয়ে একেবারে পরমাত্মীয় হয়ে যায়, দীর্ঘ পথের নিঃসঙ্গতার ক্লান্তি তাদের ভোগ করতে হয় না। আমার স্বভাব ঠিক তার উল্টো। কেউ ঘাড়ে পড়ে আলাপ করতে না এলে আমি পারতপক্ষে মুখ খুলি না, খুললেও অবিলম্বে বন্ধ করার ফিকির-ফন্দি খুঁজতে থাকি। জব্বলপুরে পরিচিত বন্ধুরা স্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে দিলেন, নামব এসে সোজা হাওড়া স্টেশনে। ট্রেনের কামরায় শুয়ে বসে বই পড়ে এবং জানলা দিয়ে দু'ধারের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে কলকাতায় পৌঁছে যাওয়া। অতি সহজ ব্যাপার—এর আর কোনো

ব্যতিক্রম নেই। হঠাৎ মাথায় দুর্মতি চেপে গেল। কাশী দর্শন করতে হবে। এর আগে কোনোদিন কাশী যাইনি। যদিও আমি ঘোর নাস্তিক তবু মনে মনে একটা গোপন বাসনা সেই বাল্যকাল থেকেই লালন করে এসেছি যে, কাশীর গঙ্গায় তিনবার ডুব দিয়ে বাবা বিশ্বনাথ দর্শন করতে হবে। ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের টানেই যে কাশীদর্শনের বাসনা, তা নয়। সহস্র বৎসরব্যাপী কাশী হচ্ছে ভারতসংস্কৃতির পীঠস্থান। দেশের জ্ঞানী গুণী, পণ্ডিত, আচার্য, মহাপুরুষ সবাই এসেছেন এই কাশীতে। বিশ্বনাথের ঘাটে ব্রাহ্ম মুহূর্তে অবগাহনের পর সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন, জবাকুসুম-সঙ্কাশং ধ্বান্তে মারকতদ্যুতিম্। সেই সব পূর্বাচার্যদের স্মরণ করে, তাঁদেরই প্রণাম জানাবার বাসনা নিয়েই আমি বারাণসী যাওয়া স্থির করে ফেললাম।

ভোরবেলা মোগলসরাই স্টেশনে নেমে বাস-এ করে বারাণসী গিয়েই নিজেকে সঁপে দিলাম পাণ্ডার হাতে, মোটা দক্ষিণার বিনিময়ে গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ দর্শন হল। এবার ফেরার পালা। পাণ্ডাই বলে দিলে যে, কষ্ট করে আবার মোগলসরাই যাবার কী দরকার। বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকেই তো বেলা ৪টায় কলকাতার গাড়ি পাওয়া যাবে।

স্টেশনে এসে কুলীর মাথায় বিছানা আর সুটকেস চাপিয়ে বললাম, 'কলকাতা যানেওয়ালী গাড়ি পর লে চলো।'

'হাঁ সাব, পুল পার হোকে চলিয়ে তিন লম্বর পিলাটফারম।'

যথাসময়ে গাড়ি এল, উঠে বসলাম। বারানসী দর্শনের পুণ্য অর্জন করে চলেছি, আর ভাবনা নেই। এবার সোজা কলকাতা।

ঘণ্টাখানেক বাদে কী এক স্টেশন মনে নেই, টিকিট চেকার এসে আমার টিকিট দেখে বলল—

'আপনি আসছেন জব্বলপুর থেকে। তবে এই ট্রেনে চড়লেন কেন?'

টিকিট চেকার প্রশ্নটা যেন একটু বিস্ময় ও বিরক্তির ভাব নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

একটু বিব্রত বোধ করলাম। বুঝতে পারছি, কিছু একটা গোলযোগ ঘটেছে। চেকারকে সবিস্তারে আমার কাশীদর্শনের বিবরণ দিয়ে বললাম—'এটা কি কলকাতার গাড়ি নয়?'

চেকার বললেন—'কলকাতার গাড়ি ঠিকই, তবে যাবে লুপ লাইন দিয়ে সাহেবগঞ্জ হয়ে। আপনাকে গাড়ি বদল করতে হবে, তার উপর গঙ্গা পার হবার হাঙ্গামাও আছে। তার চেয়ে মোগলসরাই থেকে কলকাতার গাড়ি ধরলে এসব ঝুট ঝামেলা পোয়াতে হতো না।'

এ-কথা শোনার পর সেই যে গুম মেরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, আর উঠিনি। রাত্রে আহারাদির চেষ্টা করা বৃথা, কারণ ও-অঞ্চলের কোনো স্টেশনেই খাবার জোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার।

পেটে ক্ষিধে, মাথায় দুশ্চিন্তা অথচ চোখে ঘুম। ঘুম এল অধিক রাত্রে। ভোরবেলা সক্রিগলি ঘাটে এসে কখন ট্রেন থেমেছে টের পাইনি। এখানেই স্টীমারে উঠে নদী পার হতে হবে। একটা কুলির ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন কামরা জনশূন্য। বিছানা ছেড়ে উঠে জুতোজোড়া পায়ে গলাতে গিয়ে দেখি নেই। বেঞ্চির তলায় খুঁজতে গিয়ে জুতো তো সেখানে পেলামই না, সুটকেসটিও হাওয়া। হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিল। মাথার বালিশটা এক হ্যাঁচকায় সরিয়ে ফেললাম। হাতঘড়ি ও মনিব্যাগ অদৃশ্য। রেলের টিকিটটা ছিল মনিব্যাগের ভিতর।

কুলিভাড়া দেবার পয়সা পর্যন্ত হাতে নেই। খালি পায়ে বেডিংটা ঘাড়ে বয়ে সে-যাত্রা যে-ভাবে কলকাতা পৌঁছেছিলাম তা আরেক কাহিনী, কিন্তু সেই ঘটনার পর একলা দেশভ্রমণে আর আমি কখনো বেরোইনি।

১৯৬১ সালে প্রথম যেবার ইংলণ্ড ও ইয়োরোপ ভ্রমণে যাই সে-বার সঙ্গে ছিলেন চারজন সমধর্মী ঝানু সাংবাদিক। প্রত্যেকেরই চালচলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও সাজপোশাকে একাধিকবার সত্য বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ছাপ তখনো উজ্জ্বল। সুতরাং আমার মতো ঘর-কুনো লোকের প্রথম শূন্যে পাড়ি দিয়ে বিদেশ যাওয়া কিছুমাত্র ক্লেশকর ছিল না। বয়সে কিঞ্চিৎ বড় হলেও নাবালক শিশুটির মতো বিদেশ ভ্রমণের পাঠ তাঁদের কাছ থেকে আমাকে পদে পদেই নিতে হয়েছে। 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা' বলে সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষের হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম। তিনিও 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করে আমাকে পশ্চিম জার্মানী, ভিয়েনা, সুইটজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রোম দেখিয়েছেন, আমি ছায়ার মতো তাঁকে শুধু অনুসরণ করেছি। নিজেকে সম্পূর্ণ তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ায় আমার যেমন এই ভ্রমণের কোনো ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়নি, তেমনি স্বাবলম্বী হবার সুযোগও আমি পাইনি। দুইমাস একত্রে ইয়োরোপ ঘোরার পর ফেরার পথে রোম শহরের এয়ার-টার্মিনাস-এ একটু নিজের পায়ে দাঁড়াবার উদ্যোগ করায় প্রচণ্ড ধমক খেতে হয়েছিল সঙ্গী সন্তোষকুমারের কাছ থেকে, যার ফলে তিন ঘণ্টা বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। কলকাতায় অনুরূপ কিছু ঘটলে অন্তত তিন মাস বাক্যালাপ দূরের কথা, মুখ-দেখাদেখিই বন্ধ হয়ে যেত।

হোটেল থেকে পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে একটা ট্যাক্সি করে দু'জনে রোম শহরের এয়ার-টার্মিনাস-এ এসে পৌঁছেছি। আমরা লুফৎহানসা এয়ার সার্ভিসের যাত্রী, ফিরব কাইরো করাচী হয়ে কলকাতা। শহরের মাঝখানে বিরাট টার্মিনাস, বাইরে সারে সারে বিভিন্ন এয়ার লাইনস-এর বাস দাঁড়িয়ে। যার যখন উড়বার কথা তার একঘণ্টা আগে এইসব বাস তাদের বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবে।

বিরাট হল, তার মধ্যে কাঠের ফ্রেম দিয়ে তৈরী বিভিন্ন এয়ার

সার্ভিসের ছোট ছোট খুপরী। প্রত্যেক খুপরীতে একজন লোক বসে। কোনো কোনো খুপরীতে তরুণীও আছে। তাদের কাজ যাত্রীদের সঠিক সন্ধান দেওয়া—কখন ফ্লাইট, কখন টার্মিনাস থেকে বাস যাত্রীদের নিয়ে বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা করবে। বি-ও-এ-সি, প্যান-আমেরিকান, আলিটালিয়া, এয়ার ফ্রান্স, এস-এ-এস ইত্যাদির কাউন্টার পার হয়ে লুফৎহানসার খুপরী খুঁজে পাওয়া গেল। সন্তোষবাবু আগে চলেছেন, আমি আছি তাঁর পিছনে। লুফৎহানসার কাউন্টারের সুদর্শনা তরুণীটির সঙ্গে কথা বললেন সন্তোষবাবুই—কারণ বরাবরই ব্যাপারটা ছিল আমার এক্তিয়ারের বাইরে। সন্তোষবাবু আমাকে বললেন যে, টারমিনাস থেকে বাস ছাড়তে এখনো এক ঘণ্টার উপর দেরি। অগত্যা জিনিসপত্র নিয়ে কাউন্টারের সামনে একটা বেঞ্চির একপাশে বসে পড়লাম। দেশ-বিদেশের যাত্রীদের ভিড়—তরুণ-তরুণী, ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাই এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। দু-তিন মিনিট অন্তর এক-এক কাউন্টার থেকে মাইক্রোফোনে ইতালীয় ও ইংরেজী ভাষায় কিছু একটা ঘোষণা হতেই যাত্রীদের মধ্যে সাড়া জাগে, কোনো কোনো যাত্রী কাউন্টারে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে আসছে।

দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি, দীর্ঘ সময় কী করে কাটাই। সংলগ্ন রেস্তোরাঁয় বসে গরম অথবা ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে সময় কাটাবো তার উপায় নেই, পকেটের অবস্থা তখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। একমাত্র ভরসা, আমরা ছিলাম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। সুতরাং বিমানে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি নিখরচায় পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। বিদেশী মুদ্রার যেটুকু সঞ্চয় সঙ্গে ছিল তা ক্যাব ড্রাইভারকে চুকিয়ে দেওয়ার পর আমরা প্রায় মুক্ত পুরুষ। অগত্যা বেঞ্চিতে বসে অন্যান্য বিদেশী যাত্রীদের চাল-চলন সাজ-পোশাক দেখে দু'জনে গবেষণা করতে লেগে গেলাম—কে কোন দেশের যাত্রী। এ-ভাবে আধ ঘণ্টার উপর সময় পার হবার পর সন্তোষবাবু বললেন

—'আজ সকাল থেকে কোনো খবরের কাগজ চোখে দেখা হয়নি। কী করা যায় বলুন তো?'

হুঁকো-কলকেয় একবার গুড়ুক-টান না দিতে পারলে তামাক-সেবীর যেমন পেট ফুলে ওঠে, সকাল বেলায় দুনিয়ার সংবাদের উপর অন্তত একবার চোখ না বোলাতে পারলে সাংবাদিক সন্তোষকুমারের ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। আমি বললাম—'একটু খোঁজ করে দেখুন না, নিশ্চয় কাছেপিঠে কোথাও খবরের কাগজের স্টল আছে। একটা ইংরেজী কাগজ পেয়ে যেতে পারেন।'

কথাটা সন্তোষবাবুর মনঃপূত হওয়ায় তখুনি উঠে পড়লেন এবং যাবার সময় পই-পই করে বলে গেলেন—'খুব সাবধান। বেঞ্চি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। জিনিসপত্রের উপর কড়া নজর রেখে বসে থাকুন, ইটালী দেশটার কিন্তু ও-বিষয়ে ভারতবর্ষের মতোই সুনাম। আমি কাগজ কিনে এক্ষুনি চলে আসছি।'

ছোটো ছেলেকে স্টেশনে মালপত্রসহ বসিয়ে রেখে অভিভাবক যেমন পানটা সিগারেটটা অথবা টিকিট কিনতে যান, তেমনি সন্তোষবাবু আমাকে বসিয়ে রেখে পত্রিকার সন্ধানে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চুপচাপ বসে আছি আর শুনছি বিভিন্ন কাউন্টার থেকে বিদেশী ভাষায় কী-সব ঘোষণা করে চলেছে; তার কিছুই আমার বোধগম্য নয়। হঠাৎ নজরে পড়ল লুফৎহানসার কাউন্টারের সেই সুন্দরী তরুণী মাইক্রোফোনটা মুখে লাগিয়ে কী যেন বলে চলেছে। মনে হল, বিমান বন্দরে প্লেন আসা-যাওয়ার সময়-সূচক কোনো সংবাদ হবে। প্লেন হয়তো বিমান বন্দরে এসে পৌঁছবার সময় হয়ে গিয়েছে; বাস হয়তো অবিলম্বে যাত্রীদের নিয়ে রওনা হবে। সন্তোষবাবুও কাছে নেই, এখন উপায়? বাস যদি আমাদের ফেলে চলে যায়! পকেট তো গড়ের মাঠ। শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরের বিমান-বন্দরে যাবার ট্যাক্সিভাড়া পাবো কোথায়! আর যদি আজকের

প্লেন-এ না যেতে পারি তাহলে তো রোম শহরে আরেক রাত্রি বাস করতে হবে, কিন্তু হোটেলে তো স্থান জুটবে না। একটা আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় পরে তরুণীর কাছে গিয়ে সঠিক সংবাদটি জানবার কৌতূহল কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারলাম না। সন্তোষবাবুর খড়ির দাগকে উপেক্ষা করেই বেঞ্চি ছেড়ে লুফৎহানসার কাউণ্টারে এসে সুন্দরী রমণীটিকে সবেমাত্র প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, এমন সময় শোনা গেল একটা চাপা গর্জন—'আপনাকে না বলেছিলাম বেঞ্চিতে বসে থাকতে ?'

আমি অপ্রস্তুত। সুন্দরীটি বঙ্গভাষা বুঝতে না পারলেও প্রকাশ-ভঙ্গীর ধরনটা অনুমান করে অবাক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সন্তোষবাবু একটা ইংরিজি পত্রিকা হাতে ঠিক তন্মুহূর্তেই কাউণ্টারে এসে উপস্থিত হবেন, ধারণা করতে পারিনি। থমথমে গম্ভীর মুখ। রেগে গেলে রক্ষে নেই, মুখে তুলকালাম শুরু হয়ে যাবে। সন্তোষবাবুর মুখচোখের অবস্থা দেখে অনুমান করলাম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঝড় উঠবে।

উঠলও। রাগে অভিমানে ফেটে পড়লেন।—'আপনি তাহলে আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। তাই নিজেই খোঁজ করতে এসেছেন কখন বাস্ ছাড়বে। দু' মাস ধরে সারা ইউরোপ আপনাকে আগলে রেখে এত ঘোরাঘুরি করেছি, অবিশ্বাসের কোনো কারণ ঘটেছিল কি ? আজ কেন আপনি আমার উপর আস্থা না রেখে, আমার উপর নির্ভর না করে এবং আমার কথা উপেক্ষা ও অবিশ্বাস করে জানতে এসেছেন কখন বাস ছাড়বে ? আমি কি আপনাকে ফেলে পালিয়ে যেতাম ?'

বন্যার তোড়ের মতো আমাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করে থামলেন।

অপরাধ করে ফেলেছি, তাই গলাটা যতখানি সম্ভব মোলায়েম

করে বললাম—'আপনি যা ভেবেছেন ঠিক তা নয়। মহিলাটি এইমাত্র কী একটা মাইক্রোফোনে বললেন, আমি কথাগুলি বুঝতে পারিনি। হয়তো আমাদের বাস ছাড়বার সময়ের কিছু পরিবর্তন হয়েছে মনে করেই আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।'

এ-যুক্তি গ্রাহ্যেই আনলেন না। রাগে দুঃখে অভিমানে উত্তেজিত কণ্ঠে সন্তোষবাবু বললেন—'আপনি যখন আমাকে একবার অবিশ্বাস করেছেন, নিজেই নিজের ভার নেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, তখন আপনার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আপনার সঙ্গে এখন থেকে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি নিজেই নিজের পথ দেখুন, আমি আমার।'

হন্‌হন্ করে চলে গেলেন সন্তোষবাবু। পরিত্যক্ত বেঞ্চিটার উপর বসে উল্টো দিকে ফিরে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন।

আমিও পূর্ববঙ্গের সন্তান, আমিও ঘোষের বাচ্চা। রাগ আমারও কি কিছু কম? দুম্ দুম্ করে হেঁটে গিয়ে আমার স্যুটকেস্ ও এয়ার-ব্যাগটা এক ঝটকায় তুলে হলঘর থেকে সোজা বেরিয়ে এলাম রাস্তায়, যেখানে এয়ার-সার্ভিসের বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের জিম্মায় বাক্সটা গছিয়ে দিয়ে বাসে উঠে একেবারে সামনের সিট-এ বসে পড়লাম —এবার যখন খুশি বাস ছাড়ুক, এরোপ্লেনে উঠে পড়তে পারলে আর আমার ভাবনা কি। মন-মেজাজ খুবই খারাপ, রাস্তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছি। মিনিট কুড়ি পরে লুফৎহানসার যাত্রীরা একে-একে সবাই বাসে উঠতে লাগল; সন্তোষ-বাবুও তাঁর এয়ার-ব্যাগ নিয়ে বাসের পিছনের দিকে গম্ভীর মুখে বসে পড়লেন। ওঁর মুখের ভাবটা আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে আমিও ততোধিক গম্ভীর, মুখ রাস্তার দিকে ফেরানো। এয়ার পোর্টে এসেও যে-যার পথে চলেছি অনেকখানি ব্যবধান রেখে। পাসপোর্ট ভিসা ইমিগ্রেশন ইত্যাদির প্রতিবন্ধক পার হয়ে ট্রানজিট

লাউঞ্জে গিয়ে উপস্থিত, সেখানেও দু'জন দু'জায়গায় দুদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

বিমানে ওঠার দরজাটা খুলে দেওয়া মাত্র সন্তোষবাবু তড়বড়িয়ে ছুটে গেলেন আগেই, পাছে আমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায়, পাছে কথা বলে ফেলতে হয়। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল বিমানে উঠে।

প্রথম শ্রেণীতে পাশাপাশি দুটি বসবার সীট। আমাদের দু'জনের সীটের নম্বরও পাশাপাশি। অগত্যা সন্তোষবাবুর পাশেই আমাকে বসে পড়তে হল। উভয়েরই মুখ থমথমে, বাক্যালাপ বন্ধ।

মাথার উপর আলোর অক্ষরে জ্বলে উঠল: "ধূমপান করবেন না, আসনের বেল্ট এঁটে নিন।" এবার প্লেন ছাড়বার সময়। পশ্চিম জার্মানীর বিমান যখন, তার পরিচারিকা দু'টি জার্মান তরুণী ত্রস্তপদে এ-দিক ও-দিক আসা-যাওয়া করছে। যাত্রীদের কাছে এসে স্মিতহাসির সঙ্গে এগিয়ে ধরছে লজেন্স-এর ট্রে অথবা সিগারেটের প্যাকেট। একটি সুঠামদেহী এয়ার-হোস্টেস চকিত নয়নে পাশাপাশি বসা দুই ভারতীয়ের গম্ভীর মুখ দেখে লজেন্স আর সিগারেট নিয়ে এল। তাতেও আমাদের ভাবের অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন নেই। পাশ দিয়ে আসা-যাওয়ার সময় প্রতিবারই চপল কটাক্ষে আমাদের নিরীক্ষণ করছিল।

আন্তর্জাতিক বিমানের এয়ার-হোস্টেসরা যাত্রীদের পরিচর্যা করে থাকে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু তাদের স্নিগ্ধ মধুর হাসি থেকে শুরু করে কল্যাণ হস্তের সেবার মধ্যে কোথায় যেন কৃত্রিমতা আছে। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। প্রতিদিনের কর্তব্যকর্ম যন্ত্রের মতো তারা করে যায়, মুখের হাসিটুকুও মনে হয় সেই যান্ত্রিকতারই অংশ। তবে একটা বিষয়ে এদের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। যে কোনো যাত্রীর মুখের ভাব দেখেই এরা বুঝতে পারে—কে অসুস্থ বোধ করছে, কে মৃত্যুভয়ে ভীত, কে নার্ভাস। সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক অবস্থাকে দুশ্চিন্তা থেকে অন্য খাতে ফেরাবার জন্য মুহুর্মুহুঃ

এটা-ওটা-সেটা সামনে এনে ধরে! তাতেও যদি সে স্বাভাবিক স্তরে এসে না পৌঁছয়, তাহলে বরফজল আর অডিকোলনে সিক্ত ফেস্-টাওয়েল দেবে মুখে কপালে ঘাড়ে বোলাবার জন্যে। এ-ছাড়া মিঠে ও কড়া নানাবিধ উত্তেজক পানীয় তো আছেই।

পূর্ণযৌবনা সুঠামদেহী যে এয়ার-হোস্টেসটির কথা আমি বলছি, সে বার বার ফিরে ফিরে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। বিমানযাত্রায় সাধারণত পাশাপাশি যাত্রী ভিন্ন দেশীয় হলেও ভাষার অসুবিধা না থাকলে দু-চারটে প্রশ্নোত্তর থেকে আলাপ জমে ওঠে। অথচ আমরা দুই ভারত-সন্তান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি বসে আছি, কারোর মুখে কোনো কথা নেই। ইতিমধ্যে দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কায়রো বিমান বন্দরে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য অবতরণ করতে হবে।

আমাদের গোমরামুখো নীরবতা দেখে এয়ার-হোস্টেস নিজেও বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিল। করাই স্বাভাবিক। শারীরিক অসুস্থ না হয়ে পড়লে কোনো যাত্রীকে মনমরা দেখলে এয়ার-হোস্টেসরা মনে করে, এটা যেন তাদেরই কর্তব্যের ত্রুটি। যাত্রীদের হাসিখুশি রাখাটাই তো এদের কাজ। দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেল অথচ আমরা দু'জনে রামগরুড়ের ছানা হয়ে বসে আছি। এয়ার-হোস্টেসটি বোধহয় এ-দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে, প্যাসেজের ধারে আমার সীট, তাই আমাকে এসে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল—'তোমাদের কি কিছু প্রয়োজন আছে?'

আমি ততোধিক মোলায়েম কণ্ঠে বললাম—'আপাতত কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

মেয়েটির বুদ্ধি প্রখর। বুঝতে পারল, আমি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছি। এবার সে স্মিতহাস্যে বললে—

'কোল্ড ড্রিংকস্?'

'নো কোল্ড ড্রিংকস্।'

'হট কফি ?'

'নো কফি।'

'কোল্ড বিয়ার ?'

'নো বিয়ার।'

'স্কচ হুইস্কি ?'

'নো হুইস্কি।'

'জার্মান শ্যামপেন ?'

এবারেও যথারীতি 'নো শ্যামপেন বলতে যাব, হঠাৎ পাশে থেকে সন্তোষবাবু বলে উঠলেন—'আর তো সহ্য করা যায় না সাগরবাবু; দোহাই আপনার, দয়া করে 'হ্যাঁ' বলে ফেলুন আর বলে দিন যেন দুটো গেলাস দেয়।'

দমবন্ধ আবহাওয়ার মধ্যে এতক্ষণ বসেছিলাম, এবার যেন খানিকটা মুক্ত হাওয়া এসে আমাদের মনের গুমোট দূর করে দিল। আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই মেয়েটি ছুটে স্টোর-রুম থেকে শ্যামপেনের একটি ছোট্ট বোতল আর দুটি গ্লাস ট্রেতে সাজিয়ে আমাদের দিয়ে গেল, মুখে তৃপ্তির হাসি। বোতল থেকে শ্যামপেন দুটি গ্লাসে সমপরিমাণে ঢেলে দেবার সময় বললে—'আশা করি, এবার তোমাদের যাত্রা আনন্দের হবে।'

"ডাঙ্কেশ্যেন ফ্রলাইন।" ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বললাম। খুশির মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি "বিটেশ্যেন" বলে বিদায় নিল। সেই মুহূর্তেই সন্তোষবাবু গেলাসটা শূন্যে তুলে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। ঠোকাঠুকি হল।

'চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।'

যে ভ্রমণ-পথের কথা লিখব বলে এ-কাহিনী শুরু করেছিলাম, কথায় কথায় সে-পথ ছেড়ে অনেকদূর সরে এসেছি। আবার

স্বস্থানে ফেরা যাক। ভারতবর্ষের আকারের তুলনায় তিনগুণ বড় মার্কিন দেশে আমাকে একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী দুমাস ভ্রমণ করতে হয়েছে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। এই ভ্রমণের সবটাই আমার পক্ষে অবিমিশ্র আনন্দের না হলেও দেশ ভ্রমণে আমার নাবালকত্ব দশা যে কিছুটা ঘুচেছে, সেটুকুই আমার লাভ। তথাপি প্রতি মুহূর্তেই মনে হতো, সন্তোষ ঘোষ যদি আমার সঙ্গে থাকতেন! বিদেশ বিভুঁইয়ে নিঃসঙ্গ ভ্রমণে মানসিক অবসাদ অনেক সময় শরীরের উপরেও তার প্রভাব বিস্তার করে। তার পরিণাম খুবই মারাত্মক। তখন যেখানেই যাই, সে-স্থান যত মনোরমই হোক, মনের উপর কোনো স্থায়ী ছাপ রাখে না। ক্যামেরার চোখ দিয়ে একটার পর একটা দৃশ্যের ছবি তোলা হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মনের ফিলম্ যে তখন ধোঁয়াটে হয়ে আছে, ছবি উঠবে কেন! তিন মাস পর স্মৃতির ভাণ্ডার মন্থন করতে গিয়ে দেখি ও-দেশের অনেক ঘটনাই হারিয়ে গেছে, অনেক দৃশ্যই ভাসা-ভাসা ছাপ রেখেছে। তারি মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে আমেরিকার পুব ও পশ্চিম প্রান্তের দুটি ঘটনা, যা সবিস্তারে আমি এখানে বলতে চাই।

যে সময়ে আমি নিউইয়র্ক গিয়ে পৌঁছেছি সে সময়টাকে মার্কিন-বাসীরা বলে 'সামার সীজন'। মে-জুন-জুলাই—এই তিনটি মাস দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের কাছে আদর্শ সময় এবং মার্কিন দেশের সবগুলি বড় বড় শহরের মধ্যে নিউইয়র্ক জাঁকজমক সাজসজ্জায় আমোদ-প্রমোদে জমজমাট। ভ্রমণকারীদের তীর্থস্থান এই শহরে স্বদেশ ও বিদেশের মানুষদের আকর্ষণ করবার নানাবিধ উপচার সাজিয়ে রেখেছে। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় আমি যখন নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছি তখন সবেমাত্র আরব-ইজরাইল যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছে। ইউনাইটেড নেশন্‌স-এ তখন চলেছে ঘোর তর্ক-বিতর্ক। নিউইয়র্ক শহরের শতকরা ৩০ জন মার্কিনী

হচ্ছে ইহুদি, এবং বহু অর্থবান ও প্রতিষ্ঠাবান ধনপতি হচ্ছে ইহুদি বংশের সন্তান। সুতরাং যুদ্ধে আরব-ইজরাইল সংঘর্ষে আরবের পরাজয় ও ইজরাইলের জয় যেন রাশিয়ার পরাজয় ও আমেরিকার জয়। অন্তত নিউইয়র্কের রাস্তাঘাটে আলোচনায়, সংবাদপত্রের শিরোনাম ও মন্তব্যে, কফিখানার আড্ডায়, পানশালার বিতর্কে এই রকমই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইজরাইলের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করে তুলবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার চাঁদা উঠল রাতারাতি। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ইজরাইল সাহায্য-রজনী। হলিউডের জনপ্রিয় শিল্পীরা নাচ গান ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন, পত্রিকায় পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপনে অনুষ্ঠানসূচী ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সব টিকিট নিঃশেষ হয়ে গেল চড়া দামে।

এত উত্তেজনার মধ্যেও উৎসবমুখর নিউইয়র্কের দিন আর রাত সর্বদাই ভ্রমণকারীদের জন্য আমোদ-প্রমোদের সহস্র উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছে। মার্কিনীদের মুখেই শুনছি, নিউইয়র্ক নাকি সদাজাগ্রত শহর, কখনো সে ঘুমোয় না। বিশেষ করে মানহাটান আর ব্রডওয়ে অঞ্চলের রেস্তোরাঁ আর পানশালা আগন্তুকদের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা উন্মুক্ত। যত রাত বাড়ে খরিদ্দারের ভিড় ততই জমজমাট। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে সাইরেনের মতো হুঁসিয়ারী আওয়াজ তুলে পুলিসের গাড়ি পাড়া সচকিত করে ছুটে যায়, কোথাও কোনো নাইট ক্লাব বা পানশালার উন্মত্ত জনতার উপদ্রবকে শান্ত করবার জন্যে।

শুধু মার্কিন দেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান এই নিউইয়র্ক শহর। বোধহয় এই কারণেই আজ নিউইয়র্ককে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল সিটি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্যারিসের যে গৌরব ছিল, তার অনেকটা হরণ করেছে নিউইয়র্ক। সেকালে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ ছিল—'সী

প্যারিস অ্যাণ্ড ডাই।' অর্থাৎ মৃত্যুর আগে প্যারিস দেখে নাও, আফশোষ থাকবে না। একালের প্রবাদ হচ্ছে - 'মাস্ট্ সী নিউইয়র্ক বিফোর ইউ ডাই।' মৃত্যুর আগে অন্তত নিউইয়র্ক দেখে নেওয়া অবশ্যই চাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পীর দল এই সময়ে নিউইয়র্কে আসেন তাঁদের শিল্পকীর্তির পসরা নিয়ে। আমি যখন নিউইয়র্কে উপস্থিত তখন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলছে লণ্ডনের রয়্যাল ব্যালের নৃত্যানুষ্ঠান, যার টিকিট সম্পূর্ণ বিক্রী হয়ে গিয়েছে তিন মাস আগেই। মেক্সিকো থেকে এসেছে লোকনৃত্যের শিল্পীর দল। রাশিয়া থেকে বলশই থিয়েটারের ব্যালে দল আসবে, তাদের টিকিট নিয়ে মার্কিনীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি। পরে জানতে পেরেছিলাম, বলশয় থিয়েটারের দল আর আসেনি; আরব-ইজরাইল সংঘর্ষজনিত রাজনৈতিক ঘটনাই হয়তো তার অন্যতম কারণ। ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে চিত্রকররা এসেছেন তাঁদের চিত্রকলা নিয়ে। প্রদর্শনী শহরের সর্বত্র। এই শহরে যদি শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকীর্তির যোগ্য মর্যাদা পান তাহলে সারা মার্কিন দেশেই শুধু নয়, ইওরোপেও তাঁদের খ্যাতি ও যশ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া মার্কিনী দর্শকদের মন যদি জয় করা যায় তাহলে মৌখিক উৎসাহই শুধু নয়, আর্থিক উৎসাহেও শিল্পীরা লাভবান হন। পণ্ডিত রবিশঙ্করের কথাই ধরা যাক। নিউইয়র্কের পত্র-পত্রিকায় রবিশঙ্করের সচিত্র সাক্ষাৎকার, তাঁর সংগীত পরিবেশনার অবিমিশ্র প্রশংসাসূচক সমালোচনা একাধিকবার বিভিন্ন পত্রিকায় আমি দেখেছি। আমেরিকান লাইফ ম্যাগাজিন-এ রবিশঙ্করের উপর সচিত্র প্রবন্ধ দেখে আমার ধারণা, আমেরিকার দৃষ্টিতে রবিশঙ্কর আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, ওদেশে একাধিক কলারসিককে বলতে শুনেছি, রবিশঙ্কর আজ ওয়ার্লড্স্ গ্রেটেস্ট মিউজিশিয়ান। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভ্রমণ করে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সেতার ও তবলা, রবিশঙ্কর ও আল্লারাখার বিপুল জনপ্রিয়তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

এতক্ষণ নিউইয়র্কের উজ্জ্বলতম অংশের কথাই বললাম, এবার বলব এই চোখ-ধাঁধানো মহানগরীর আরেকটি অঞ্চলের কথা—যা গ্রীনিচ্ ভিলেজ নামে পরিচিত। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এই অঞ্চলকে শহর না বলে শহরতলীই বলা সংগত। এখানে কখনো স্কাই-স্ক্র্যাপার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি, বুলডোজারের দাপটে এখানকার ম্যাকডুগাল অ্যালে, প্যাচিন প্লেস এবং কর্মাস স্ট্রীটের কাণা গলি ও সরু রাস্তার মাধুর্য আজও ধ্বংস হয়নি। নিউইয়র্কের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে গ্রীনিচ ভিলেজ আজও বেঁচে আছে। এ অঞ্চলে প্রবেশ করলে মনে হয় যেন কলকাতার কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ও নবাগন্তুকদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, আপন আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যে-কোনো ধর্মের মানুষ এখানে আপন মনে বাস করতে পারে। নিজের বিশ্বাস, ধর্ম, খেয়ালখুশি নিয়ে জীবন-যাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এখানে। বোধহয় এই কারণেই এই ভিলেজ প্রাণপ্রাচুর্যে এত মুখর, সৃষ্টির উন্মাদনায় এত চঞ্চল। একঘেয়ে জীবনের বাঁধা রাস্তায় এখানকার মানুষ চলে না,সর্বদা নূতনত্বের আস্বাদ নিয়ে সে প্রাণবন্ত থাকতে চায়। সাহিত্যিকদের কাছে গ্রীনিচ ভিলেজ প্রেরণার উৎসস্থল—যে কারণে টমাস পেইন, হেনরী জেমস, হেরমান মেলভিল, এডগার অ্যালেন পো, মার্ক টোয়েন এবং থিয়োডোর ড্রেসার প্রমুখ মার্কিন লেখকবৃন্দ তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ এই ভিলেজেই কাটিয়েছেন। আধুনিক যুগের প্রখ্যাত বৃটিশ কবি ডিলান টমাস গ্রীনিচ ভিলেজকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন, এখানেরই এক হোটেলে অপরিণত বয়সেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে আছেন ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার অনুগামী মার্কিনী কবি অ্যালেন গীনস্‌বার্গ। গীনস্‌বার্গের প্রভাব আজ আমেরিকা ছাপিয়ে ইওরোপে সুবিস্তৃত, বিশেষ করে তাঁর কাব্যদর্শন ও জীবনদর্শনের প্রতি তরুণদলের দুর্মর আকর্ষণ তাঁকে প্রায় গুরুর আসনে বসিয়েছে। গীনস্‌বার্গের কবিতার বই 'হাউল'

প্রায় লক্ষাধিক কপি বিক্রী হয়েছে এবং তাঁর কবিতার আবৃত্তির গ্রামোফোন রেকর্ড তাঁর বইয়ের চেয়ে কম জনপ্রিয় নয়। আমেরিকা ও ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায়ই গীনস্‌বার্গের ডাক আসে বক্তৃতা দেবার জন্যে। বর্তমানে তাঁর বক্তৃতার ফী ৭০০ ডলার।

গীনস্‌বার্গের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কলকাতায়। তার আগে ওদেশের পত্র-পত্রিকায় বীট কবিদের গুরু অ্যালেন গীনস্‌বার্গ সম্পর্কে পড়া ছিল। চার বছর আগে দেশ পত্রিকার দপ্তরেই এখানকার জন দশ-বারো তরুণ কবির সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল ওঁর একাধারে সখা, সচিব ও প্রিয় শিষ্য পিটার ওরলভস্কি, সে-ও কবি।

এক শনিবার দুপুরে পিটার এসে আমাকে নিয়ে গেল তাদের গ্রীনিচ ভিলেজের আস্তানায়। বেলা তখন দুটো। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি, ফুটপাথের দুপাশে দেওয়াল ও রেলিংয়ের গায়ে চিত্র প্রদর্শনী চলছে। প্রতি বছর সামার-সীজনে এখানে উন্মুক্ত পথের দুধারে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী হয়। এবারে সবসমেত ৮০০ শিল্পী যোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে আমেরিকান শিল্পীর সংখ্যাই বেশী। অনেকে এসেছে সিঙ্গাপুর ম্যানিলা কোরিয়া অথবা জাপান থেকে। ছবিগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, প্রত্যেক শিল্পীর অঙ্কনরীতি ও বিষয়বস্তুর পার্থক্য তাঁর দেশের পরিচয় বহন করছে। দর্শকদের ভিড়ও কম নয়। একেক জন শিল্পীর কুড়ি-পঁচিশখানা ছবি একটা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো, শিল্পী নিজে এক কোণে একটি কাঠের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। পায়ে হেঁটে ছবি দেখতে দেখতে ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি এসে পড়েছি। নেড়া পার্ক, সবুজ ঘাস প্রায় নেই বললেই হয়। অনেকটা আমাদের শ্রদ্ধানন্দ বা দেশবন্ধু পার্কের মতোই দেখতে। পার্কের মাঝখানে একটি বিরাট গাছ ডালপালা বিস্তার করে ছায়া সিঞ্চন করছে। গাছের তলায় কিছু জনতার ভীড়, সেখান থেকে

ভেসে আসছে সমবেত কণ্ঠের গান। দূর থেকে মনে হল, চেনা সুর যেন শুনতে পাচ্ছি। বহু তরুণ-তরুণী আর নিগ্রোদের ভিড় ঠেলে ভিতরে উঁকি মেরে যা দেখলাম ও শুনলাম তা ছিল আমার কল্পনার অতীত। গাছের তলায় জন দশ-বারো সাদা মার্কিনী ছেলে, বয়স তাদের বাইশ-তেইশের বেশী নয়, বিশুদ্ধ সুরে ও উচ্চারণে নাম-সংকীর্তন করছে। ছেলেদের সকলেই মুণ্ডিতমস্তক, গায়ে হলুদ-রঙে ছোপানো গেঞ্জি, পরনেও হলুদ রঙের ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তারা নেচে নেচে গাইছে:

হরে রাম হরে রাম
  রাম রাম হরে হরে—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
  কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

শুধু এই চারটি লাইন গেয়ে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শনিবার সকাল এগারোটায় শুরু হয়েছে এই গান, বিরামহীন এই নাম-সংকীর্তন শেষ হবে সোমবার সকাল এগারোটায়। একজনের কাঁধে একটি ছোটো সিঙ্গল রীডের পেটি হারমোনিয়াম, কাঁধের উপর দিয়ে সাদা কাপড়ে গিঁট বেঁধে সেটি ঝোলানো। দু'জনের হাতে খঞ্জনী, ছন্দ রেখে টুং টুং করে বাজিয়ে চলেছে, আরেকজন বাজাচ্ছে একটি ঢোলক। খোল বাজানো বোধহয় এখনো রপ্ত করে উঠতে পারেনি। গানের দলে জন ছয়েক তরুণীও আছে। তারা গানের ছন্দে ছন্দে মৃদু হস্ত সঞ্চালন করে নৃত্যভঙ্গিমার চেষ্টা করছিল। গাছের তলায় একটি ইজেলের উপর বৃহদাকারের একটি রঙিন বাংলার পট, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ার পথে শিষ্যদের নিয়ে দুই হাত তুলে নগর-সংকীর্তন করতে করতে চলেছেন। ছবিটির তলায় রোমান হরপে বড় বড় করে লেখা আছে সেই চারটি লাইন যা তারা সমস্বরে গাইছে। বহু দর্শক ও শ্রোতা—তাদের মধ্যে আমেরিকান নিগ্রোও আছে, তারাও

এই ভক্ত মার্কিনী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটি অনুসরণের চেষ্টা করে চলেছে।

এই দৃশ্য আমাকে যখন বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তুলেছে, পিটার তখন কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল—'যা দেখছো এটা কিন্তু হুজুগের ব্যাপার নয়। আজকের দিনের মার্কিনী তরুণ-তরুণীদের মনে তাদের সমাজের বিরুদ্ধে একটা তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ তারই প্রতিক্রিয়া।'

অবাক হয়ে আমি বললাম—'কেন? অসন্তোষের কারণ কি?'

'অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটির বিরুদ্ধে এটাই এদের বিদ্রোহ।' খুবই গম্ভীর হয়ে পিটার আরো বললে—'জানো, এতকাল ধরে এদেশের ছেলেমেয়েদের সামনে লিন্‌কনের জীবনকে আদর্শরূপে তুলে ধরে বলা হয়ে আসছে—লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউস। অর্থাৎ টাকা টাকা আর টাকা। টাকা হলেই ক্ষমতা, যশ, প্রতিপত্তি, সম্মান। না থাকলে সমাজের চোখে তুমি করুণার পাত্র।'

পিটারের কথাটা আপাত সত্যি হলেও কেমন যেন বেমানান মনে হচ্ছিল। আমি বললাম—'তোমাদের দেশের মানুষরা পরিশ্রমী। পরিশ্রমের তো একটা ফল আছেই, সেই ফল আজ সে ভোগ করছে। এতে প্রতিবাদ করার কী অর্থ?'

পিটার হেসে বললে—'আমাদের দেশ যুদ্ধ বাধাতে পারে, আবার দুটো অ্যাটম বোমা ফেলে যুদ্ধ থামাতেও পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পৃথিবীর মানুষকে এ-ছাড়া আর কিছু দিতে পেরেছে কি? চাল গম দিয়ে পেটের খোরাক মেটাতে পারে, মনের খোরাক নয়।'

আমিও উত্তরে হেসে বললাম—'ও ভারটা আমাদের দেশের উপরই ছেড়ে দাও। তুমি বলছিলে 'লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউস' তোমাদের মোটো, আর আমাদের হচ্ছে প্রাসাদ ছেড়ে দীনতম কুটিরে চলে যাওয়া; তাই তো রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজৈশ্বর্য ও বিলাস ছেড়ে ছিন্ন বাস পরে গেলেন অরণ্যে।'

পিটার উৎফুল্ল হয়ে বললে—'এইজন্যই তো আমরা ইণ্ডিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণর জীবন ও বাণী বিষয়সর্বস্ব পার্থিব জগতের অনেক নীচতা দীনতা হীনতা থেকে তোমাদের মন ও চিন্তাকে মুক্ত রেখেছে। আমাদের দেশের তরুণরাও কিছু কিছু তার আস্বাদ পেতে চাইছে বলেই এরা আজ নাম-সংকীর্তন নিয়ে মেতে উঠেছে।'

পিটারের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এতকাল জেনে এসেছি, প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকা তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস বৈভবের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঈর্ষার কারণ। কিন্তু এ-দেশে এ-যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও যন্ত্রণা আছে, অতৃপ্তি আছে, অশান্তি আছে। শুধু তাই নয়, এ থেকে তারা আজ মুক্তির পথ খুঁজছে ভারতবর্ষের কাছেই!

এদিকে গাইয়েদের ঘিরে দর্শকদের ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। আগেই বলেছি, এই সময়ে নিউইয়র্কে ভ্রমণকারীদের সমাগমের সময়। গ্রীনিচ ভিলেজ পরিদর্শনে ভ্রমণকারীদের আকর্ষণের প্রধান কারণ হল, এ-অঞ্চলের মানুষরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। আপরুচি খানা, আপরুচি পরনা—কেউ বাধা দেবে না। এখানে নিজের খেয়াল-খুশি মাফিক জীবনযাপনে প্রত্যেকেরই অবাধ স্বাধীনতা। তুমি আমীর হও বা ফকির, এদের কাছে তোমার মূল্য সমান। সুতরাং ওয়াশিংটন পার্কের এই গাছতলায় বিদেশীরা দলে দলে নাম-সংকীর্তনকারীদের ছবি ক্যামেরা আর মুভীতে ধরে রাখতে ব্যস্ত। যারা গাইছে তারা কিন্তু নির্বিকার। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেই পটের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টি রেখে দুই হাত তুলে নেচে নেচে তারা গেয়েই চলেছে। জুন মাসের গরম। দরবিগলিত ঘাম ঝরছে ওদের গা বেয়ে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তন্ময় হয়ে ওরা গাইছে—হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

নিউইয়র্কে এসে গ্রীনিচ ভিলেজের এই অভিজ্ঞতাকে মার্কিনীদের

হুজুগের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই হয়তো আমি উপেক্ষা করতাম, কিন্তু তা সম্ভব হল না ঠিক এক মাস পরে আমেরিকার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে লস এঞ্জেলেস্-এর আরেকটি মর্মন্তুদ ঘটনায়।

জুলাই মাসের তিন তারিখে এসেছি লস এঞ্জেলেস্-এ। থাকব মাত্র পাঁচ দিন। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় দ্রষ্টব্য দেখে নেবার জন্যে ঘোরাঘুরির অন্ত নেই। ৬ই জুলাই সকালে স্থানীয় সংবাদপত্র 'লস এঞ্জেলেস্ টাইমস্' পত্রিকার প্রথম পাতায় রামকৃষ্ণ-দেব ও তাঁর পাশে এক সুন্দরী মার্কিনী তরুণীর ফটোগ্রাফ দেখে চমকে উঠলাম। ছবির পাশে বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা—

Chances Reported Poor

Human Torch Fights for Life

এর তলায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে আমি স্তম্ভিত। সংবাদটি হচ্ছে ঃ

হলিউড অঞ্চল সংলগ্ন চিত্রতারকাদের বাসস্থান যে পাহাড় অঞ্চল ঘিরে, তাকে বলা হয় বেভারলি হিলস্। এটি ধনীদের পাড়া। এই পাড়ারই একটি সুন্দরী তরুণী নিজের গাত্রবস্ত্রে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। ডাক্তারেরা বলছেন মেয়েটির বাঁচবার আশা খুবই কম।

নাম ন্যানসি লুইস মূর, বয়স চব্বিশ। শরীরের ৯০ ভাগ দগ্ধ অবস্থায় তাকে জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়েছে।

পিতা জন মূর নর্থ আমেরিকান এভিয়েশনের পদস্থ অফিসার। খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন হাসপাতালে কিন্তু কন্যার তখনো চৈতন্য ফিরে আসেনি।

ন্যানসির বাবা পুলিসের কাছে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এই কয়েকদিন আগেই তিনি বেভারলি হিলস্-এর পুলিস বিভাগে তাঁর কন্যার নিরুদ্দেশের কথা জানিয়ে বলেছিলেন যে, কুমারী মেয়েটি মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিল এবং ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল।

দুর্ঘটনার আগের দিন সকাল সাড়ে আটটায় কুমারী ন্যানসি বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়। দু'ঘণ্টা পরে মেয়ের নিরুদ্দেশের সংবাদ পেয়েই মিঃ মূর বেভারলি হিলসের পুলিস বিভাগে রিপোর্ট করেন।

পুলিসের কাছে মিঃ মূরের বিবৃতিতে জানা যায়, ন্যানসি লম্বায় ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, দেহের ওজন ১৪৫ পাউণ্ড। মাথার চুল সোনালী, চোখের তারা নীল এবং পরনে কালো স্কার্ট ও সোনালী ব্লাউজ। পিতার অনুমান, ন্যানসি সানফ্রান্‌সিসকো যাবার উদ্দেশ্যেই ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

কিন্তু সেদিনই দুপুর দেড়টায় ন্যানসি লস এঞ্জেলেস্‌-এর ডেরমণ্ট রোড-এর একটি মোটর গাড়ির সার্ভিস স্টেশনে এসে উপস্থিত। সময়টা লাঞ্চ খাবার, সাধারণত লোকজনের আনাগোনা সে-সময় কমই থাকে। ন্যানসি নিঃশব্দে পেট্রোল পাম্প থেকে হোস পাইপটা তুলে নিজের স্কার্ট ও ব্লাউজ পেট্রলে ভিজিয়ে নিল। পাম্পের কাছে এসে ন্যানসি এমন একটা কাণ্ড করছে তা কারোর নজরে পড়েনি।

সার্ভিস স্টেশনের একটি ছোকরা তখন কাচের ঘরের ভিতরে বসে টিফিন খাচ্ছিল। নাম তার রিচার্ড কোলম্যান, বয়েস ত্রিশেরও কম। পুলিসের কাছে সে বলে যে, হঠাৎ দেখতে পায় মেয়েটি ক্যাশিয়ারের বুথের কাছে এগিয়ে এসে একটা দেশলাই জ্বেলে আগুনটা বুকের কাছে ধরা মাত্র সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মেয়েটির সর্বাঙ্গে। চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কোলম্যান, ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে যখন সে ছুটে এসেছে তখন আগুন ন্যানসিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে। শুধু দেখতে পেল ন্যানসির বাঁ হাতে ধরা আছে এক শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষের ফটোগ্রাফ, সেই ছবির প্রতি তখনো মেয়েটির ধ্যাননিমগ্ন দৃষ্টি আবদ্ধ। ছবিটি সম্বন্ধে পুলিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইনিই হচ্ছেন হিপিদের আধ্যাত্মিক গুরু।

এই সংবাদটি যেমন মর্মান্তিক, তেমনই বিস্ময়কর। আমি দেখে

অবাক হলাম যে, শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষের ছবিটি রামকৃষ্ণদেবের, কিন্তু সংবাদের রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টে কোথাও রামকৃষ্ণদেবের নাম উল্লেখ করেনি। ছবির পরিচয়ে শুধু বলা হয়েছে—হিপিদের ভারতীয় আধ্যাত্মিক গুরু। পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে, কিন্তু তার ক্যাপশনেও রামকৃষ্ণদেবের নামের উল্লেখ নেই।

পরদিন লস এঞ্জেলেস্ ছেড়ে আমি চলে যাই সানফ্রান্‌সিসকোয়। সেখানে পথে-ঘাটে অগণিত 'হিপি'দের দেখেছি সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংসার-বিবাগী তরুণ-তরুণী উন্মুক্ত আকাশের নীচে আলো ও বাতাসের সঙ্গে মুক্ত প্রেমের টানে ঘরছাড়া। শুনেছি লক্ষাধিক আমেরিকান বিবাগী ছেলেমেয়ে তখন সানফ্রান্‌সিসকোয় সমবেত হয়েছে। সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠাবান একাধিক সাদা আমেরিকানকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি, নিগ্রো-সমস্যাকে ওরা বড় সমস্যা বলে মনে করে না। আজ ওদের চিন্তিত করে তুলেছে 'হিপি' ও 'বীট' সম্প্রদায় বলে যে নতুন জেনারেশন দেখা দিয়েছে তারাই। এরাই হচ্ছে আমেরিকার ভবিষ্যৎ বংশধর। আজ অর্থে সামর্থ্যে প্রাচুর্যে গড়া এই আমেরিকাকে এরা কোন্ ভরসায় এই উত্তরাধিকারীদের হাতে ছেড়ে দেবে—যাদের টাকার প্রতি মোহ নেই, বিলাস ঐশ্বর্যে ঘৃণা, পিতামাতার সম্পত্তির প্রতি নেই কোনো লোভ। এরা সেই অগণিত সিদ্ধার্থের দল যারা আজ ভোগ ঐশ্বর্য বিলাসের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মনের অস্থিরতা ও যন্ত্রণা জুড়োবার জন্যে সানফ্রান্‌সিসকোর পথে পথে দীনদরিদ্র বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ন্যানসি চেয়েছিল, সে নিজে মশাল হয়ে জ্বলে উঠবে মোহান্ধকারে পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে পথের সন্ধান দেবার জন্যে। সেইজন্যেই বোধহয় রামকৃষ্ণদেবের ছবির দিকে ধ্যাননিমগ্ন দৃষ্টি রেখে দেশলাইয়ের আগুন সে বুকের কাছে ছুঁইয়েছিল।

ন্যানসিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ন্যানসি 'মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।'

১০

জীবনে ভোম্বলদা বা বেণুদার মত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ আরও দেখেছি, এবং এ-ও দেখেছি, প্রত্যেক মানুষের জীবনই নাটকীয় উপাদানে ভরা। কমেডি আর ট্রাজেডির টানাপোড়েনে বোনা মানব-জীবন যেন নক্সী-কাঁথার এক-একটি বিচিত্র ডিজাইন, কোন এক অদৃশ্য শিল্পী সবার অলক্ষ্যে থেকে আপন মনে এঁকে চলেছেন।

আমার কৈশোর জীবনে দেখা যে চার-চরিত্রের কথা আমি এখন বলতে বসেছি, তারা হচ্ছে লম্বোদরের বংশধর।

পুব বাংলার চাঁদপুর মহকুমার মধ্যে বাজাপ্তি গ্রামে ছিল আমার পৈতৃক ভিটা। আমাদের পাশের গ্রামের লম্বোদর ভট্টাচার্য ছিলেন সে-তল্লাটে নামকরা ভোজনবিলাসী ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তাঁর ভোজনপর্ব সম্পর্কে আমাদের গ্রামে মজার মজার কাহিনী প্রচলিত, তারই একটি আজ আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

লম্বোদর ভট্টাচার্য যখন বুঝতে পারলেন, তাঁর শেষ সময় উপস্থিত, তিন ছেলেকে কাছে ডাকলেন।

বড় ছেলে স্ফীতোদর, মেজো বৃকোদর আর কনিষ্ঠ পুত্র কৃশোদর মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতার শয্যাপাশে এসে বসল।

মৃত্যুপথযাত্রী লম্বোদর দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে ছেলেদের বললেন—আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। যাবার আগে তোমাদের কাছে একটি মাত্র অনুরোধ, লোকে যেন বলে পিতার উপযুক্ত সন্তান তোমরা, বাপের নাম রেখেছো। তাহলেই পরলোকে আমার আত্মা শান্তি পাবে।

লম্বোদরের তিন পুত্রই পিতার এই উপদেশ নতমস্তকে শিরোধার্য করে নিল, নিশ্চিন্ত হয়ে লম্বোদর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লম্বোদর ভটচাজকে আমি আমার বাল্যকালে একাধিকবার দেখেছি এবং আমাদের গ্রাম থেকে পুবে পাঁচ মাইল দূরে চালতা-তলীর বৈদিক বাড়ির এই স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন আমাদের বিশেষ কৌতুক ও কৌতূহলের বস্তু।

শৈশবে আমরা যখন পুজোর ছুটি ও গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে যেতাম, তখন আমার বৃদ্ধা ঠাকুরমার হাত ধরে পাঁচ মাইল হেঁটে একবার এই চালতাতলীর বৈদিক বাড়িতে যেতে হতো, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ লম্বোদরের পাদোদক পান করে দীর্ঘায়ু হবার জন্যে। ঠাকুরমা একবাটি জল লম্বোদরের পায়ের কাছে ধরতেন, খড়ম থেকে আলগোছে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে সেই বাটির জলে ছুঁয়ে দিতেন। সেই জল ভক্তিভরে আমাদের মাথায় ছিটিয়ে দিতেন ঠাকুরমা, পরে বাকি জলটুকু আমাদের খেয়ে ফেলতে হতো।

সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কাছে দু'টাকা প্রণামী রেখে ঠাকুরমা আবার আমাদের সেই পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়ে গ্রামে ফিরে আসতেন।

লম্বোদর ভটচাজ সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-স্পর্শিত পাদোদক সেবনের জন্য নয়, এরকম সার্থকনামা উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণ আমার জীবনে দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি।

আমাদের গ্রামে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হলেই লম্বোদর ভটচাজকে বলতেই হতো এবং তিনি যখন তাঁর তিন শিশুপুত্রদের সঙ্গে নিয়ে ভোজনে বসতেন তখন তা দেখবার জন্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে ভিড় লেগে যেত।

আমার কৌতূহল ছিল ঠিক এই কারণেই। ছেলেবেলায় কলকাতার ফুটপাথে মাদারীদের যাদুবিদ্যা দেখে আমরা বিস্মিত হতাম। অনায়াসে একটার পর একটা লোহার গুলি খেয়ে ফেলে আবার তা বার করে যখন দেখাত তখন তাজ্জব বনে যেতাম,

হাততালির ধুম পড়ে যেত দর্শকদের মধ্যে। লম্বোদরের খাওয়াটাও ছিল ঠিক এই ধরনের এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এক হাঁড়ি রসগোল্লা একটার পর একটা টপাটপ খেয়ে ফেলতেন, নিমেষে হাঁড়ি শেষ। বলাই বাহুল্য, যাত্নকরের লোহার বল-এর মতো রসগোল্লা তাঁকে আর বের করতে হতো না।

ছেলে তিনটিও তৈরী হয়েছিল চৌকশ। বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও হাত চালাত। বাপ একাই একটা হাঁড়ি শেষ করতেন, ওরা তিনজনে শেষ করত একটা। বড় ছেলে স্ফীতোদর ছিল আরো এককাঠি সরেস। রসগোল্লা শেষ হয়ে গেলে দুই হাতে হাঁড়িটা মুখের কাছে ধরে চোঁ চোঁ করে রসগোল্লার সবটুকু রস খেয়ে ছোট্ট একটা ঢেঁকুর তুলত।

হাঁড়ির পর হাঁড়ি দই মিষ্টি সাবাড় করে ব্রাহ্মণীর জন্য ছাঁদা বাঁধতেন। তিন ছেলের মাথায় তিনটি ছাঁদা চাপিয়ে নির্বিকারচিত্তে হাঁটা দিতেন নিজের গ্রাম চালতাতলীর পথে।

আমাদের গ্রামের জমিদার দত্তরা ছিল দুই শরিক। বড় বাড়ি আর ছোট বাড়ির মধ্যে সর্বদাই রেষারেষি চলত। দুর্গাপূজার সময় কোন বাড়ির প্রতিমা ভালো হয়েছে, কোন বাড়ির যাত্রার দল এবার আসর মাৎ করেছে, কোন বাড়ির পূজায় প্রজাদের ভিড় সবচেয়ে বেশি—এই নিয়ে দুই শরিকে প্রতি বছরই বচসা শুরু হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই বচসার নিষ্পত্তি হতো উভয় পক্ষের লাঠিয়ালদের মোকাবিলায়।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে গিয়েই শুনি বড় বাড়ির জমিদারের মাতৃবিয়োগ হয়েছে, দিন সাতেক পরেই পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন হবে। সে-তল্লাটের বাইশটা গ্রামের ব্রাহ্মণরা আসছেন, আর আসছেন চালতাতলীর বৈদিক বাড়ির লম্বোদর ভটচাজ, সঙ্গে তাঁর তিন ছেলে—স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদর।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, লম্বোদরের ছোট ছেলের

নামকরণের একটি ছোট্টো ইতিহাস আছে। জন্মাবার পর থেকেই লম্বোদরের কনিষ্ঠ পুত্র একটু পেট-রোগা ছিল। বেশী খেতে পারত না, খেলেও হজম হতো না। রাগ করে তাই বাপ নাম রাখলেন কৃশোদর। কনিষ্ঠ পুত্র সাবালক হয়ে উঠলেও তার নাম পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটেনি। তার দুই অগ্রজের মতো আহারে পারঙ্গম হতে না পারলেও বাপের সুনাম রক্ষার চেষ্টা সাধ্যমতো সে বরাবরই করে এসেছে।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। লম্বোদর তাঁর তিন পুত্র নিয়ে বড় বাড়ির ব্রাহ্মণভোজনে আসছেন এবং খাবেন আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।

বাইশটা গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়ল সেদিন জমিদার বাড়ির আটচালায়। সন্ধ্যাবেলায় লোকে লোকারণ্য। ব্রাহ্মণভোজন তো নয়, যেন যাত্রার আসর। আটচালার মাঝখানে তিন চারটে হ্যাজাক জ্বলছে, তারি তলায় পাত পড়েছে ব্রাহ্মণভোজনের। আসরের চারদিক ঘিরে আবাল-বৃদ্ধ নরনারী ভিড় করে দাঁড়িয়ে। ব্রাহ্মণরা একে একে আসরে এসে বসতে লাগলেন, কিন্তু লম্বোদরের দেখা নেই। আমরা উৎসুক হয়ে লম্বোদরের অপেক্ষা করছি, ওদিকে পাতে বসে পড়া ব্রাহ্মণরা অপেক্ষা করছেন লুচির ধামা হাতে নিয়ে কখন পরিবেশকের দল আসরে নামবে।

লম্বোদর কি তাহলে আসেননি? আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললে—এসেছেন, তবে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনদিন উপোসে থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছেন, তাই ক্লান্ত।

এমন সময় লম্বোদর তাঁর তিন পুত্রকে নিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন এবং নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে না বসতেই চালতা-তলীর লোকরা হর্ষধ্বনি দিয়ে বললে—ভটচাজ মশাই, গ্রামের নাম রাখা চাই।

লম্বোদর পাশে উপবিষ্ট তিন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনলি তো! গ্রামের নাম আমি ঠিকই রাখব, বাপের নাম তোদের রাখা চাই।

শুরু হল খাওয়া। এ তো খাওয়া নয়, যেন ভাগাড়ে শকুন পড়েছে। নিমেষের মধ্যে ধামা ধামা লুচি, বেগুনভাজা, মাছের মুড়োর ডাল, মাছের ঝোল, মাংস নিঃশেষ হতে লাগল। পাত চেটেপুটে পরিষ্কার করেই হাঁকডাক শুরু—কই, লুচি কই, মাছের তরকারী কই, বেগুনভাজা কই—

পরিবেশনকারীরা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করছে, জমিদারবাবু স্বয়ং আসরে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। চারদিকে গোল হয়ে ভিড় করে দাঁড়ানো দর্শকের দল যে-যার গ্রামের ব্রাহ্মণদের চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে।

এবারে ভোজনপর্বের শেষের দিক। দই মিষ্টি পরিবেশন শুরু হয়েছে। লম্বোদরের কাছে আসতেই তিনি পরিবেশনকারীকে শুধু বললেন—কেন বার বার কষ্ট করবেন, তার চেয়ে তিন হাঁড়ি দই আর তিন হাঁড়ি মিষ্টি আমাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে যান। তাতে আপনাদেরও পরিশ্রম বাঁচবে, আমাদেরও হাঁকডাক করে আপনাদের বিরক্ত করতে হবে না।

জমিদারবাবু তৎক্ষণাৎ সেই ব্যবস্থাই করলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদের তখন পেট ফাটো-ফাটো অবস্থা, উঠতে পারলে বাঁচে। আটচালার মণ্ডপে ফরাস পাতা আছে, যাতে ব্রাহ্মণরা আহারান্তে কোনো রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে এসেই শুয়ে পড়তে পারে।

লম্বোদর ততক্ষণে দইয়ের হাঁড়িটা শেষ করে একটা মিষ্টির হাঁড়ি পাতের উপর টেনে নিলেন। শুধু একবার বললেন—গোটা কতক লেবু আর কাঁচালঙ্কা দিন, মাঝে মাঝে মুখটা মেরে নিতে হবে।

বশংবদ তিন বংশধরও বাপের সঙ্গে সমান তাল রেখে খেয়ে চলেছে। কনিষ্ঠ পুত্র কৃশোদর হাত চালাচ্ছে বটে, তবে দাদাদের

মতো অতটা পটুত্বের সঙ্গে নয়। লম্বোদর একবার কৃশোদরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চাপাস্বরে রেগে বললেন—কুলাঙ্গার।

আসরের অন্যান্য ব্রাহ্মণরা ভোজনান্তে অনুমতি নিয়ে কোনো-রকমে মণ্ডপের ফরাস বিছানো শয্যায় পেট ভাসিয়ে শুয়ে পড়েছে, লম্বোদর ও তাঁর তিন পুত্র তখনো হাঁড়ির মিষ্টি শেষ করতে ব্যস্ত।

হাঁড়ির শেষ রসগোল্লাটা মুখে পুরেই লম্বোদর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোদের হল? এইবার উঠে পড়।

জ্যেষ্ঠপুত্র স্ফীতোদর তখন রসগোল্লার হাঁড়িটা দুই হাতে মুখের কাছে ধরে রসটা খেতে ব্যস্ত। উপযুক্ত পুত্রের কাণ্ডটা দেখে লম্বোদরের মুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব। মনে মনে তিনি বুঝে গেলেন, এই ছেলেই তাঁর নাম রাখবে। রসিকতা করে বললেন —দেখিস, পাঁপড়ভাজা দেয়নি বলে রাগ করে হাঁড়িটা কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলিস না।

আহারান্তে বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করলেন না লম্বোদর ভটচাজ। তিন ছেলের মাথায় ব্রাহ্মণীর জন্য ছাঁদা চাপিয়ে গ্রামে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বড়বাবু জমিদার করজোড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—ভটচাজ মশাই, বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছেন তো?

লম্বোদর বললেন—ব্রাহ্মণদের আহারে কি কখনো তৃপ্তি আছে? কিছু অতৃপ্তি নিয়েই ফিরতে হয়। তবে আয়োজনের কোনো ত্রুটিই আপনি রাখেননি। আপনার মায়ের আত্মার কল্যাণ হোক।

লম্বোদর তাঁর তিন পুত্রকে নিয়ে যাত্রা করলেন গ্রামের পথে। চালতাতলী গ্রামের দর্শকদল হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সঙ্গে সঙ্গে চলল। যেন কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলায় শীল্ড জিতে নিয়েছেন লম্বোদর, উল্লাসধ্বনি সহকারে সঙ্গে চলেছে সমর্থকের দল।

সেই খাওয়াই লম্বোদরের শেষ খাওয়া। গ্রামে তিনি সুস্থভাবেই ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এসে সেই যে শয্যা নিলেন,

আর উঠলেন না। তিন পুত্রকে কাছে ডেকে তাঁর সুনাম রক্ষার গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তিনি চক্ষু মুদলেন।

ইতিমধ্যে অনেক বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশ দ্বিখণ্ডিত হল, সেই থেকে আমাদেরও আর স্বগ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেনি। কৈশোর জীবনে গ্রামের বহু স্মৃতির সঙ্গে লম্বোদর ভটচাজের কথা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর তিন পুত্র পিতার সুনাম কীভাবে রক্ষা করছেন জানবার অসীম কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচে যাওয়ায় চালতাতলীর এই ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো খবর আর রাখতে পারিনি।

বছরখানেক আগে আমার এক পিসতুতো ভাই এসেছিল কলকাতায়। উদ্দেশ্য ছিল, শহরতলীর কোথাও একটু জমি সংগ্রহ করে বাড়ি তুলবেন। দেশের গ্রামে আর থাকা নিরাপদ নয়, কোনো রকমে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করতে পারলেই সবাইকে নিয়ে আসবেন।

আমার সঙ্গে দেখা হতেই কথায় কথায় গ্রামের কথা উঠল, সেই প্রসঙ্গে চালতাতলীর বৈদিক বাড়ির লম্বোদর ভটচাজের বংশধর তিন ভাইয়ের কথাও। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করার পরিণাম শুনে আমি স্তম্ভিত। সেই ঘটনাই এবার আপনাদের বলি।

লম্বোদরের তিরোধানের পর তাঁর তিন পুত্র স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদরের দিন খুবই কষ্টে চলছিল। দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে; সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। হিন্দু জমিদাররা প্রায় সবাই পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে এসেছে। যে দু-চারজন আছে, তাদের আর সেই বোলবোলাও নেই। যে-কয় ঘর গৃহস্থ হিন্দু পরিবার নিতান্তই পৈতৃক ভিটার টানে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, তারা নিজেদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত। ঘটা করে পূজাপার্বণ পারলৌকিক

ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান আর সম্পন্ন করা তাদের সামর্থ্যেও কুলায় না, মানসিক অবস্থাও অনুকুল নয়। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনের রেওয়াজ প্রায় উঠেই গিয়েছে। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান তিলাঞ্জলি তর্পণ করেই সমাধা করতে হয়। বাপের নাম রাখবার জন্যে তিনভাই ব্যাকুল, কিন্তু সে সুযোগ তাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে।

ইতিমধ্যে যুগটাও গিয়েছে পালটে। শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকর্মাদিতে একালের তরুণদের মতি নেই—তারা মনে করে, ওটা বাজে খরচ।

স্ফীতোদর তার দুই ভাই বৃকোদর ও কৃশোদরকে বললে—দেখ, এখানে পড়ে থেকে আর কি হবে। যজমানরা তো প্রায় সবাই এদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছে। ক্রিয়াকর্মাদিতে আমাদের তো আর কেউ ডাকে না, ডাকলেও রীতিরক্ষার্থে নমো নমো করে সেরে দেয়। তার চেয়ে চল আমরাও চলে যাই।

বৃকোদর দাদার প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—তা কেমন করে হয়। এখনও তো কয়েক ঘর হিন্দু গ্রামে আছে। আমরা চলে গেলে তাদের চলবে কি করে।

ছোটো ভাই কৃশোদর বললে—তাছাড়া কলকাতায় আমাদের মাথা গুঁজবার কোনো ঠাঁই নেই। এখানে তবু তো পৈতৃক ভিটেটা আছে। ওখানে শুনেছি, চাল ডাল তেল ঘি সব কিছুতেই ভেজাল। ভেজালের দেশে গিয়ে অম্লরোগে প্রাণটা দেওয়ার চাইতে এখানে শাক ভাত অনেক ভালো। অবস্থার একটু উন্নতি হলে যজমানরা সবাই আবার নিজের নিজের গ্রামে ফিরে আসবে, ওরা ফিরলে আমাদেরও কপাল ফিরবে।

ছোট ভাই কৃশোদরের কথাটা স্ফীতোদর ও বৃকোদর ফেলতে পারল না বটে, তবে ওদের কপাল আর ফিরবার লক্ষণ নেই।

অবশেষে সত্যিই একদিন কপাল ফিরল। ভৌমিকবাড়ির বড় কর্তা দেহরক্ষা করলেন। অবস্থাপন্ন কায়স্থ পরিবার, ছেলেরা বৃদ্ধ পিতাকে অনেকবার বলেছিল, এ-দেশ ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে

থাকতে, বৃদ্ধ কিছুতেই রাজী হননি। যে-ভিটেতে জন্মেছেন সেই ভিটেতেই দেহরক্ষা করলেন এবং এইটিই ছিল তাঁর একমাত্র সংকল্প। ছেলেরা তাই স্থির করল ঘটা করে পিতৃশ্রাদ্ধ করবে।

সে-তল্লাটে কতগুলি হিন্দু গ্রাম ছিল। সেই সব গ্রামের অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ব্রাহ্মণভোজনের, সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ হয়েছে চালতাতলীর ভটচাজ বাড়ির তিন বংশধরের।

স্ফীতোদর, বৃকোদর ও কৃশোদর এমনিতে প্রায় অর্ধাশনেই দিন কাটাচ্ছিল, এবারে ব্রাহ্মণভোজনের সাত দিন আগে থেকে পুরো অনশনে থেকে গেল। বহুকাল পর পিতৃনাম রক্ষার সুযোগ পেয়েছে তিন ভাই। তাদের সংকল্প, দশ গাঁয়ের লোক যেন একবাক্যে বলতে পারে—হ্যাঁ, লম্বোদরের উপযুক্ত বংশধর বটে।

ভোজনের দিন প্রাতঃকালে স্নান সেরে পূজার্চনাদি সমাধানের পর কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে নতুন ধুতি ও চাদর পরে ছাঁদা বাঁধবার জন্য তিনজনে তিনটি নতুন গামছা মাথায় চাপিয়ে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল।

ভৌমিকবাড়ি চালতাতলী থেকে মাইল আষ্টেক হাঁটা পথ। এবারে গ্রামবাসীরা ব্রাহ্মণভোজন দেখবার জন্যে সঙ্গে কেউ আর গেল না। তারা জানে, এটা নিতান্তই অভাবের দিনের ভোজন; এখানে রেষারেষি করে, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কোনো ব্রাহ্মণই ভোজন করতে যাচ্ছেন না। সুতরাং খাওয়া দেখে উৎফুল্ল হওয়ার ব্যাপারই এটা নয়।

গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত এসে গ্রামবাসীরা তিন ভাইকে বিদায় দিয়ে বললে—তোমরা লম্বোদর ভট্টাচার্যের উপযুক্ত বংশধর, পিতার অন্তিম বাসনা তোমরা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে। তাছাড়া চালতাতলী গ্রামের সুনামও তোমরা রেখে আসবে আশা করি।

স্থির হল, ব্রাহ্মণভোজন যখন দ্বিপ্রহরে তখন সূর্যাস্তের আগেই

তিন ভাই ফিরে আসবে, গ্রামবাসীরা গ্রামের সীমান্তে ওদেরই প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় থাকবে।

দুপুর পেরিয়ে বিকেল হল। সূর্য তখন প্রায় পশ্চিমপ্রান্তে' হেলে পড়েছে। গ্রামের পুব প্রান্তের বড় বকুল গাছের তলায় গ্রামবাসীরা দল বেঁধে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে তিন ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের। কারোর দেখা নেই।

সূর্য যখন প্রায় ডোবে-ডোবে তখন সহসা দেখা গেল দূর থেকে এক্‌জন অতিকষ্টে হেঁটে আসছে। মুখটা আকাশের দিকে তোলা, পথের উপর দৃষ্টি ফেলবার উপায় নেই। একটা অর্ধচেতন দেহ কোনোরকমে থপ্‌ থপ্‌ করে হেঁটে এগিয়ে আসছে। গ্রামবাসীরা ছুটলো সেদিকে। এ নিশ্চয় তিন ভাইয়ের এক ভাই। কাছে গিয়ে দেখলে, ছোট ভাই কৃশোদর। আকণ্ঠ এমন খাওয়াই খেয়েছে যে মাথাটা নীচু করতে পারছে না, আকাশের দিকে মুখ রেখেই সে হাঁটছে।

কৃশোদরকে তার দুই দাদা স্ফীতোদর ও বৃকোদরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে কোনো রকমে হাতের ইসারায় পিছনের পথটা দেখিয়ে দিলে, কথা বলবার মতো শক্তিও তখন তার নেই।

গ্রামবাসীরা বুঝে নিল যে, পিছনে আর দুই ভাই আসছে। ছোট ভাইয়ের অবস্থাই যখন এই, তখন অপর দুই ভাইকে কী অবস্থায় দেখবে সেই কৌতূহল নিয়েই গ্রামবাসীরা এগিয়ে চলল। মাইলখানেক পথ যাওয়ার পর দেখতে পেল জন সাত-আট লোক একটা খাটিয়া কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে।

কাছে আসতেই দেখা গেল সে আর কেউ নয়, মেজোভাই বৃকোদর প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় খাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে, ভৌমিক-বাড়ির কয়েকজন ষণ্ডামার্কা পাল্‌কি-বেহারা তাকে বহন করে নিয়ে আসছে।

চিৎকার করে গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করল বড়ভাই স্ফাতোদরের কথা। সে কোথায়!

বৃকোদরের মুখেও কোনো কথা নেই। সে শুধু অতি কষ্টে ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে আঙ্গুল দেখিয়ে পথের নির্দেশ দিল। অর্থাৎ পরলোকে গেলেই দেখতে পাবে।

উৎকণ্ঠা নিয়ে আরো খানিকটা পথ এগিয়ে যাবার পর গ্রামবাসীরা দেখতে পেল, একটা বটগাছের তলায় ফাঁকা জমিতে একটা চিতা জ্বলছে, চিতার ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার। সূর্যও তখন অস্তাচলে।

১১

অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, 'সম্পাদকের বৈঠকে' আর কেন আমি লিখছি না। এ প্রশ্ন আমি নিজেকেই অনেকবার করেছি। কেন লিখছি না? এর উত্তর এককথায় বলা যায়—লিখতে পারছি না। কেন পারছি না, বিশদ করে আপনাদের বলি।

সাংবাদিকতা আর সম্পাদনা কাজে আমার দীর্ঘ বত্রিশ বছর কেটে গেল: শুরু করেছিলাম 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তারপর তিন বছর 'যুগান্তর' পত্রিকার বার্তাবিভাগে কাটিয়ে সেই যে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দিয়েছি, আজও সেই পত্রিকার সঙ্গে আমার জীবনের ভাগ্য এক চাকাতেই বাঁধা। বড়বাজারে বর্মন স্ট্রীটের নিভৃত কোণে দেশ পত্রিকার অফিসঘরটির স্মৃতি আমি আজও ভুলতে পারিনি। 'সম্পাদকের বৈঠকে' লেখার পিছনে সেদিনের স্মৃতিই আমাকে নিত্যনিয়ত উৎসাহ যুগিয়েছে। আটপৌরে একখানি ঘর, আকারে নিতান্তই ছোটো। দুখানা মাঝারি সাইজের টেবিল, খানকয়েক সংলগ্ন চেয়ার, গুটি তিনেক আলমারী। এই নিয়েই ঘর ভর্তি, আসবাবপত্রের আর কোনো বাহুল্য নেই। পূর্ব দিকের প্রশস্ত খোলা জানলা দিয়ে উন্মুক্ত আকাশ দু'চোখ ভরে দেখা যায়। জানলার ওপাশে একটি ছোটো অশ্বত্থগাছ, তার কচিপাতায় আলো আর হাওয়ার নাচন। সংবাদপত্রের কোলাহলমুখর কার্যালয়ের একপ্রান্তের এই নিরালা ঘরে সেদিন যাদের নিয়ে আমাদের বৈঠক বসত, তাঁদের অধিকাংশই সাহিত্যের প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন তরুণ লেখক। কেউ রেল আফিসে

নাইট শিফটে সদ্য কাজে ঢুকেছেন, কেউ ব্যাঙ্কের সামান্য মাইনের কেরানী, কেউ সদ্যপ্রতিষ্ঠিত দৈনিক কাগজের সাব্-এডিটর ; মাসের পর মাস মাইনে না পেয়েও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। আবার কেউ কোথাও কোনো চাকরি জোগাড় করতে না পেরে সামান্য পকেট খরচা রোজগারের জন্য সম্পাদকের ফরমাস মতন জার্নালিস্টিক লেখার জোগান দিচ্ছেন। সমাজে সেদিন এঁরা কেউই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না ; সাংসারিক দায়িত্ব হয়তো তখনো তাঁদের কাছে জোয়াল হয়ে ওঠেনি। যশ, মান, প্রতিষ্ঠা ও স্বচ্ছলতার সঙ্গে জীবনচর্যার এমন কতকগুলি পরিবর্তন আপনা থেকেই ঘটে যায়, যখন সময়ের সংকীর্ণতার সঙ্গে মানসিক প্রসারতারও সংকোচন ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। এটা আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের চারিত্র্যগত দোষ বলে আমি মনে করিনে। আমি মনে করি, আমাদের দেশের লেখকদের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। যূথবদ্ধ হয়ে সাহিত্যচর্চা আমাদের দেশের লেখকদের স্বভাববিরুদ্ধ. স্বাতন্ত্র্যেই তাঁদের স্বাভাবিক স্ফূর্তি। সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই স্বাতন্ত্র্য আপনা থেকেই লেখকদের মধ্যে এসে যায়। তাঁরা তখন নিজ নিজ পরিবেশ অনুসারে খোলস রচনা করে নেন। সাহিত্যিক সমাজ বলে একটা কথা আছে। আমাদের দেশে এ-কথার কোনো তাৎপর্য নেই। যা আছে তা হচ্ছে দল এবং এই দল গড়ে ওঠে কোনো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অথবা কোনো পুস্তক প্রকাশককে অবলম্বন করে।

'দেশ' পত্রিকার আপিস ঘরে সেদিনের বৈঠকে যাঁরা নিয়মিত আসতেন, আগেই বলেছি তাঁরা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখক হলেও তখনো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হননি। গুটিপোকার মতো খোলস রচনা করে সাহিত্যের রেশম বোনার সাধনায় তাঁরা তখনো আত্মস্থ ছিলেন না। সারাদিন যে যার কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে জমায়েত হতেন। সে-যুগের বৈঠকের উপাদান ছিল যৎসামান্য। তেলেভাজা অথবা মুড়ি

সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা। আসর সরগরম হয়ে উঠত, রাত কত হল সে-খেয়াল কারুর নেই। আড্ডার মধ্য দিয়েই পত্রিকার কাজ চলেছে, আড্ডাই ছিল পত্রিকার প্রাণ। বর্মন স্ট্রীটে অ্যাজবেস্টসের ছাতের তলায় ছোট্টো ঘরটি জন বারো তরুণ লেখকের গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠত। আসরটি ছিল মৌচাকের মতো। মধু আহরণের কাজ এই বৈঠকের আড্ডার মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে চলত। সেদিনের এই সব অখ্যাত লেখকের দল গল্প উপন্যাস কবিতা লিখে দেশ পত্রিকার রসদ জুগিয়েছেন। আবার এই মৌচাকে যদি কেউ ঢিল নিক্ষেপ করেছে, হুলের খোঁচাও তাকে কম সহ্য করতে হয়নি। সে সময়ে বিশেষ এক ধরনের রাজনীতিক মতবাদ নানা গলিঘুঁজির পথ ধরে বাঙলার সাহিত্যিক মহলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ ইত্যাদি নামের আড়ালে লেখকদের মধ্যে কমিউনিজম প্রচার ও প্রসারের এক গোপন অভিযান শুরু হয়েছিল। সে সময়ে বাংলার বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক এই চক্রান্তে প্রতারিত হয়ে এই দলে ভিড়েছিলেন, কিন্তু কিছুকাল বাদে এদের স্বরূপ চিনতে পেরে এই চক্রান্ত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আনতে পেরেছিলেন। যাঁরা পারেননি তাঁরা তাঁদের স্বাধীন শিল্পসত্তাকে এক ডগমার কাছে বিসর্জন দিয়ে আজীবন চরম যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন, অবশেষে মৃত্যু তাঁদের সেই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এ দৃষ্টান্ত বিদেশেও আছে, আমাদের দেশেও। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্মন স্ট্রীটের সেই ছোট্ট ঘরের আসরে যে সাহিত্যিকরা সেদিন মিলিত হতেন তাঁরা কখনো কোনো ইজম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। অর্থ, হাততালি, প্রচারের বহু প্রলোভন তাঁদের কাছে এসেছিল, তাঁরা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি, বিচলিতও না। আপন দেশকে তাঁরা ভালবাসেন, দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যর্থতার কথাই ছিল তাঁদের সাহিত্যধর্ম। সেই ধর্মকে পরিহার

করে তাঁরা কখনো ভয়াবহ পরধর্মে আত্মবিক্রয় করেননি।

'দেশ' পত্রিকার দপ্তরের ছোট্টো ঘরটিতে সেদিন যে বৈঠক নিত্যনিয়মিত বসত তার কথা তখন মুখে মুখে অনেকখানি প্রচার হয়ে গিয়েছিল। একটা ছোট্টো ঘটনা বলি। একবার শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে দেবানন্দপুরে আমাকে যেতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দুটি। শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান, বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি দেবানন্দপুর আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র। এই উপলক্ষে সেই তীর্থের মাটিতে আমার প্রণাম নিবেদন করে আসা ছিল প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, বৈঠকের বন্ধুদের সঙ্গে একটা দিন শহরের বাইরে আনন্দ করে কাটিয়ে আসা।

দেবানন্দপুরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরীর সঙ্গে, মিটিংবাজ সুধাংশুকুমার। 'মিটিংবাজ' বিশেষণটি আমার দেওয়া নয়, সে-সময় তিনি ঐ নামেই সাহিত্যিক মহলে পরিচিত ছিলেন। সদা-হাস্যময় বন্ধুবৎসল এই মানুষটির একমাত্র নেশা ছিল বাংলা দেশের মফস্বল শহরে ও পল্লী অঞ্চলে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা এবং সেই সম্মেলনে নিজে প্রধান অতিথি, মূল সভাপতি, শাখা-সভাপতি ইত্যাদি কোনো-না-কোনো একটি নামে ভূষিত হয়ে সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া। সেই বক্তৃতাবলী পরে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন, তার দাম ছিল পাঁচ টাকা এবং গ্রন্থের নাম ছিল 'সাহিত্য-সম্মেলনের বক্তৃতামালা'।

দেবানন্দপুর থেকে সন্ধ্যাকালে ফেরবার সময় ব্যাণ্ডেল ইস্টিশানে এসে দেখি গাড়িতে উঠবার জায়গা নেই। প্রচণ্ড ভিড়। এই ভিড়ে গুঁতোগুঁতি আমাদের ধাতে নেই, স্বভাবেও না। তাই পরের গাড়িতে যাওয়া স্থির করে ঠেলাঠেলি থেকে গা বাঁচিয়ে প্ল্যাটফর্মের একপাশে আমরা কয়েকজন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ঝড়ের মতো ছুটোছুটি করতে করতে সুধাংশুকুমার আমাদের সামনে এসে বললেন—'শিগ্‌গিরি চলে আসুন, একটা কামরা খালি পেয়েছি।'

পরোপকারী সুধাংশুবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। ছুটলাম ওঁর পিছনে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমাদের প্রায় ঠেলে তুলে দিলেন, ট্রেনও ছাড়ল। কমপার্টমেন্টে উঠেই আমাদের চক্ষুস্থির। বসবার জায়গা দূরে থাক, দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুধাংশুবাবুর দিকে তাকাতে তিনি মুখে প্রাণ-জল-করা হাসি এনে বললেন—'কেন? উপরের দুটো বাঙ্ক একেবারে খালি।'

কথা শেষ করেই এই মাঝবয়সী ক্ষীণদেহ মানুষটি তড়াক্ করে একটি বাঙ্কে ঘাড় গুঁজে উঠে পড়েই বললেন—'দাঁড়িয়ে কেন? উঠে আসুন।'

অগত্যা আমার সঙ্গীরা একে একে ওঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। সঙ্গীদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি হতবাক্। অবশেষে আমাকেও কি এই স্থূল দেহ নিয়ে বাঙ্কে উঠে গুড়ের কলসী হয়ে বসে থাকতে হবে? সুধাংশুবাবু প্রচুর উৎসাহ দিয়ে বাঙ্কের উপর থেকে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বললেন—'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, উঠে আসুন।'

গাড়িভর্তি লোকের হাসির খোরাক দিয়ে টানা হ্যাঁচড়া ও ধস্তাধস্তির পর আমাকে বাঙ্কে তুলে দেওয়া হল এবং আমার সুবিধার্থে সঙ্গীরা আমাকে অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে থাকবার সুযোগ করে দিলে। কিন্তু মনে মনে আমি প্রমাদ গণলাম। পুরো এক ঘণ্টার পথ এই অবস্থায় আমাকে যেতে হবে! মিটিংবাজ সুধাংশুবাবুর উপর আমার রাগ তখন সপ্তমে চড়েছে। রাগলে আমি আবার কথা কম বলি। অন্য সবে বাক্যালাপ শুরু করে দিয়েছে, আমিই শুধু নিরুত্তর।

আমার অবস্থা দেখে এবং বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেই সুধাংশুবাবু বললেন—'এই জন্যেই আমি বলি কি, আপনারা

কখনো এমন কোনো সভাসমিতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না যাতে সেইদিনই কলকাতায় ফিরে আসতে হয়।'

এ আবার কী কথা! আমাদের মধ্যে কে একজন বললো—'সে কি মশাই, কলকাতা ছেড়ে মফস্বল শহরে বা পাড়াগাঁয়ে কে রাত্রিবাস করতে চায়। মশার কামড়, ম্যালেরিয়া, দূষিত জল, টাইফয়েড -- কতরকম রোগের জীবাণু সেখানে গিজগিজ করছে।'

সুধাংশুবাবু বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন—'হুঁঃ, আপনারা শুধু রোগ-বীজাণুই দেখলেন, কিন্তু দেখলেন না রাত্রিবাস করলে কত আদর-আপ্যায়ন, খাতির-যত্ন আর খাওয়া-দাওয়ার কী ডঙ্কা।'

এ-কথার পর সুধাংশুবাবুর উপর আমার যত রাগ জমে ছিল তা নিমেষে উবে গেল। আমি বললাম—'এই জন্যেই কি আপনি কলকাতার বাইরে এত সভাসমিতি করে বেড়ান?'

'নিশ্চয়, তা না হলে মজুরী পোষাবে কেন। আমি সেই জন্যেই এমন জায়গায় সাহিত্যসভার আয়োজন করি যেখান থেকে সভার পর আর রাত্রে কলকাতা ফিরবার গাড়ি পাওয়া যায় না।'

সুধাংশুবাবুকে তারিফ করে একজন বললে—'এটা তো ভালো বুদ্ধি বার করেছেন।'

'তা না করলে কি চলে? সভার শেষে রাত্রে যদি কলকাতা ফেরার গাড়ি থাকে তাহলে উদ্যোক্তারা কোনো রকমে একটু চা-সিঙ্গারা মিষ্টি খাইয়ে তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে তুলে দিতে পারলেই বেঁচে যায়।'

সুধাংশুবাবুর কথা শুনে গাড়ির মধ্যে তখন হাসির রোল উঠেছে। গাড়িভর্তি লোক ওঁর দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে।

আমি বললাম—'আচ্ছা সুধাংশুবাবু, বাংলাদেশের জেলায় জেলায় শহরে গ্রামে আপনি এত সাহিত্যসভায় যাবার নিমন্ত্রণ পানই বা কি করে। রহস্যটা আমাদের একটু বলবেন? তা হলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

উৎফুল্ল হয়ে সুধাংশুবাবু বললেন—'আপনি যেতে চান? তা এতদিন আমায় বলেননি কেন? প্রধান অতিথি বা মূল সভাপতি করে না পারলেও নিদেনপক্ষে শাখা-সভাপতি করে আপনাকে আমি যে কোনো সাহিত্যসভায় নিয়ে যেতে পারি।'

আমি বললাম—'আমার যাওয়া-না-যাওয়াটা পরের কথা। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম আপনার ট্রেড সিক্রেটটা কী।'

এ-কথার পর সুধাংশুবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গাড়িভর্তি লোক-গুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর গলার স্বর একটু খাটো করে বললেন—'কাউকে যদি না বলেন তো বলি।'

আমার আশ্বাস পেয়ে বললেন—'আমার একটি নোটবুক আছে। তাতে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় কোথায় কি সাহিত্য-সমিতি বা সভা আছে তাব নাম ঠিকানা টোকা। দৈনিক পত্রিকার মফস্বল সংবাদ ঘেঁটেঘেঁটেই আমি নাম ঠিকানা সংগ্রহ করি। তারপর কোন জেলায় কোন সিজ্‌ন্ সভা সমিতির পক্ষে প্রকৃষ্ট তা জেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাচালি করি।'

আমাদের মধ্যে আরেকজন অধৈর্য হয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন—'কলকাতায় এত সাহিত্যিক থাকতে আপনাকেই তারা শুধু নিয়ে যায়?'

শ্লেষটুকু গায়ে না মেখে হাসতে হাসতেই সুধাংশুবাবু বললেন—'আমাকে না নিয়ে গেলে তো উপায় নেই। প্রধান অতিথি বা মূল সভাপতি পাবে কোত্থেকে। টিকি তো আমার হাতে বাঁধা।'

অবাক হয়ে আমি বললাম—'প্রধান অতিথি বা সভাপতি বুঝি আপনিই নিয়মিত সাপ্লাই করেন?'

'আসল কথা কি জানেন? মফস্বল অঞ্চলের সাহিত্যসমিতি-গুলির উদ্যোক্তারা অতি সরল লোক। কলকাতার সাহিত্যিকরা যে কী চীজ্‌ তারা তো আর তা জানে না। এই সেদিন দুটি ছোকরা এসেছিল বাঁকুড়া থেকে। কলেজ লাইব্রেরীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে

একজন সাহিত্যিক সভাপতি নিয়ে যেতে চায়। তারাশঙ্করবাবু তখন লাভপুরে। তাঁকে না পেয়ে তারা গেল প্রেমেন্দ্র মিত্রর বাড়ি। অনেকক্ষণ বসিয়ে গল্পগুজব করে, প্রচুর উৎসাহ দিয়ে এবং যথারীতি চা খাইয়ে ছেলেদুটিকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এত কাজের চাপ, একদিনের জন্যেও কলকাতার বাইরে যাবার উপায় নেই। প্রেমেনদা ওদের সদুপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন প্রবোধ সান্ন্যালের কাছে। ওরা গেল ঢাকুরিয়ায়। প্রথম সাক্ষাতেই প্রবোধদা ছেলেদুটিকে প্রশ্ন করলেন ঃ

'আমার বাড়ির ঠিকানা কি করে পেলে ?'

'আজ্ঞে, প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

'প্রেমেন যেতে চাইল না কেন ?'

'আজ্ঞে, ওঁর অনেক কাজ, তাই—'

ব্যস্, হয়ে গেল। প্রবোধদা কথা শেষ করতে না দিয়েই হুংকার দিয়ে উঠলেন—'প্রেমেন রিফিউজ করেছে বলেই বুঝি আমার কাছে এসেছো! ওসব হবে-টবে না, আমারও অনেক কাজ।'

ফিরে আসতে হল ওদের। সারাদিন ধরে এক সাহিত্যিকের দরজা থেকে আরেক সাহিত্যিকের দরজায় ধরনা দিয়ে দিনের শেষে বিফল হয়ে তারা ফিরে গেল।

আমাদের মধ্যে কে একজন বললেন—'বাঁকুড়া থেকে এসেছিল বলেই বেচারীদের হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হল। আসত যদি দার্জিলিং, শিলং, পুরী থেকে—'

উৎসাহ পেয়ে সুধাংশুবাবু বললেন—'এদের দুঃখ আমি ছাড়া আর কে বুঝবে বলুন! আমি তাই সারা বৎসর চিঠিপত্র লিখে প্রোগ্রাম ঠিক করে এক-একজন সাহিত্যিককে এক এক জায়গায় নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।'

আমি বললাম—'আপনি কলকাতার নামকরা লেখকদের রাজী করাতে পারেন ?'

'পারব না কেন ? সটান পায়ের উপর পড়ে বলি—দাদা, সঙ্গে আমি আছি, সব বন্দোবস্তর ভার আমার উপর। কোনো অসুবিধা, কোনো কষ্ট আমি হতে দেব না। আরামে নিয়ে যাব, আরামে ফিরিয়ে আনব। রাজী করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোক্তাদের লিখে দিই যে, অমুক সাহিত্যিককে নিয়ে যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, শর্ত একটা থাকেই।'

'শর্তটা কী শুনি ?'

'শর্ত হচ্ছে, যাঁকে নিয়ে যাচ্ছি তাঁকে প্রধান অতিথি করতে হবে আর আমি হব সভাপতি। সুতরাং দু-জনের ফার্ষ্ট ক্লাস ভাড়া আর সভাপতির স্পীচ ছাপাবার জন্য পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম দেয়।'

এতক্ষণে সুধাংশুবাবুর মিটিংবাজীর রহস্যটা বোঝা গেল। তারপর সুধাংশুবাবু অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, কোন সাহিত্যিককে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে কী কাণ্ড ঘটেছিল—একের পর এক তার কৌতুককর কাহিনী। সে-কাহিনী আপনাদের কাছে বলা যাবে না, বলা উচিতও নয়। তবে সে-কাহিনী শুনতে শুনতে কখন যে কলকাতায় পৌঁছে গেছি তা টেরও পাইনি, এমন কি বাঙ্কের উপর কাত-মেরে পড়ে থাকাটাও কষ্টকর বলে মনে হয়নি।

হাওড়া স্টেশনে নেমে বিদায় নেবার সময় সুধাংশুবাবু বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন—'আপনি কিছু ভাববেন না, আপনাকেও আমি পাইয়ে দেব।'

অবাক হয়ে বললাম—'তার মানে ? কী পাইয়ে দেবেন ?'

একগাল হেসে সুধাংশুবাবু বললেন—'এটা বুঝলেন না ? এতক্ষণ তাহলে কি বললাম। প্রধান অতিথি বা সভাপতি এখন চট করে করা যাবে না, তবে শাখা-সভাপতি করে আপনাকে নিয়ে যেতে ঠিকই পারব। প্রথমে শাখা থেকেই শুরু হোক। কী বলেন।'

আশ্চর্য হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। উত্তরে কিছু

বলবার আগেই সুধাংশুবাবু তাঁর হাসিমুখ নিয়ে প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরেই সুধাংশুবাবু পরলোকে চলে গিয়েছেন। তাঁর পক্ষে কথা রক্ষা করা আর সম্ভব হয়নি। অনুমান করতে পারি, যেখানে গিয়েছেন, সেখানে অন্তত শাখা-সভাপতি করে আমাকে নিয়ে যাবার একটা কিছু ব্যবস্থা করে সাগ্রহে আমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছেন।
